KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Card No : KLMLGK 200	Place of Publication : ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ২৩/- ২৩/- ২৪/- ২৪/-	Year of Publication : ভাদ্র ১৩৮২ // Sep 1975 কার্তিক ১৩৮২ // Nov 1975 আষাঢ় ১৩৮৩ // July 1976 ভাদ্র ১৩৮৩ // Sep 1976
	Condition : Brittle Good
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

চতুর্বিংশ বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৮৩

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

গাড়ি চালকদের প্রতি আবেদন

অহেতুক প্রাণহানি ঘটাবেন না

যেসব লেভেল ক্রশিং-এ গেটম্যান নেই, সেখানে

- থামুন
- দেখুন
- তারপর পার হয়ে যান

পূর্ব রেলওয়ে

TCP/ER 358/76

চতুর্বিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৩ আষাঢ় তেরশ' তিরাশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

মহাকাশচারী দেবতা ও মানব ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ১০৩

লৌকিক দেবদেবী ও গ্রামীণ জীবনচর্যা ॥ রেবতীমোহন সরকার ১১০

অনবদ্য শোলা-শিল্প ॥ মঞ্জুলা সরকার ১১৪

সোনামুখীর বাউল মেলা ॥ তৃপ্তি ব্রহ্ম ১১৯

ভারতের দুর্গ : প্রস্তরযুগীয় পটভূমিকা ॥ সন্তোষকুমার বসু ১২৩

রসরাজ শেখ গুমানী ॥ নিত্যরঞ্জন বসু ১২৭

আলোচনা : আমাদের রঙ ॥ কৃষ্ণরতন বিশ্বাস ১৩০

সমালোচনা : অমরতীর্থ অমরনাথ ॥ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় ১৩২
সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান ॥ পক্ষধর ভট্টাচার্য ১৩৩

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুশীল প্রিণ্টার্স ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন,
কলি-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলি-১৩ হইতে প্রকাশিত

সঞ্চয়ের তো অনেক উপায় আছে—
তবু ইউনিটে টাকা খাটাবেন কেন?

কারণ

- কোনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা আটকে না ফেলেও ইউনিট থেকে খুব ভাল লাভ পেতে পারেন।
- ইউনিটই আপনাকে আয়কর ও সম্পদকর থেকে **সবচেয়ে বেশী ছাড়ের সুযোগ দেবে**। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ইউনিট ও কতকগুলি নির্দিষ্ট শ্রেণীর বিনিয়োগের জন্য ৩০০০৲ টাকা পর্যন্ত আয়কর ও ১·৫ লাখ টাকা পর্যন্ত সম্পদকর ছাড় পাওয়া যেত। এখন **শুধু ইউনিটে বিনিয়োগের জন্য** অতিরিক্ত ২০০০৲ টাকা পর্যন্ত আয়কর এবং ২৫০০০৲ টাকা পর্যন্ত সম্পদকর ছাড় পাওয়া যায় যা আর কোনও লগ্নী থেকে আপনি পাবেন না।
- ইউনিটের লভ্যাংশের (ডিভিডেণ্ডের) হার ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে।
- নিরাপত্তা সম্বন্ধে তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না।
  এমন কি ট্রাস্টের টাকাও এখন এখানে লগ্নী করা যায়
- দরকারের সময় টাকা তুলে নেওয়া খুবই সহজ
  (জুলাই মাস বাদে)

মনে রাখবেন—

জুলাই মাসে ইউনিট বিশেষ সুবিধাজনক দরে পাওয়া যায়

আমাদের বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্পনার বিশদ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, স্থানীয় এজেন্ট বা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

UNIT TRUST OF INDIA

ইউনিট ট্রাস্ট অব্ ইণ্ডিয়া

৮ কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১
ফোন :—২৩-৯৩৯১
২৩-১৬৩৮

আষাঢ়
তেরশ' তিরাশী

সমকালীন

চতুর্বিংশ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

মহাকাশচারী দেবতা ও মানব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

বিংশ শতাব্দীর ভারতবাসী দেখছে অনুভব করছে আণবিক শক্তির কল্যাণকারিত্ব, ধ্বংস কারিত্ব, জেট, রকেট, বিমানে দেশদেশান্তরে ঋতিতি যাতায়াত, রেডিও, টেলিভিসন টেলিগ্রাফ টেলিফোনের সাহায্যে দূরশ্রুতি, দূরেক্ষণ, বিদ্যুৎ শক্তিকে মানুষের করায়ত্ব করে তার সাহায্যে এককালে যা অসাধ্য ছিল, তা হয়েছে অনায়াস সাধ্য, পাতালের ভোগবতীর জল গৃহের যে কোন স্থানে এসে আজ হয়েছে সুপেয় পানীয়, এমনি আরও কত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আজ আর দৈববিজ্ঞান নয়, সবই মানব বিজ্ঞান।

তবুও ভারতবাসী বলতে পারে না এ সবের আবিষ্কার আমরাই করেছি। সে বলতে পারে স্মরণাতীত কাল থেকে এই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে আমরা নানান্ ধরণের, নানান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভগবান, এবং সম্প্রদায় কীর্ণতার সঙ্গে কত রকম ধর্মীয় সংস্থা গঠন করেছি, আর প্রতিটি সম্প্রদায়ের অভিমতের সঙ্গে অন্যটির পার্থক্য থাকলেও জগৎ মিথ্যা ঈশ্বর সত্য বা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই সূত্রটির সঙ্গে সকলকে এক করতে পেরেছি। তাই আমরা মায়াময় বিশ্বের অন্তর্গত এই ভারতে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সত্যতা স্বীকারও করিনা এবং উৎকৃষ্ট মেধার মনস্বিতাকে অবতারদের চর্চা ছাড়া অন্য চর্চার বাণীলিপিরও প্রশ্রয় দিই নাই।

এমন ভারতীয় কৃষ্টির উৎসঙ্গে থাকার অভ্যাস এক শত বর্ষের নয়, সহস্র বর্ষেরও নয়, তারও ঢের ঢের পূর্বে এই আত্মকেন্দ্রিক ও আত্ম বিকেন্দ্রিক চিন্তার প্রবাহ। সেই প্রবাহে পতিত ভারতবাসী তার অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দলিলের নজির খুঁজতে গেলে প্রথমে তুলে ধরে দুখানি মহাকাব্যের ঘটনাপঞ্জীর সঙ্গে নিজেদের সামাজিক ইতিহাসের পরিবর্তে ঐতিহ্য ধারা, যে দুটির মধ্যে একটি রামায়ণ

অন্যটি মহাভারত। কিন্তু দুটি মহাকাব্যের তুলনামূলক পাঠগুলি বিচার করলে দেখা যায় রামায়ণ এবং মহাভারত সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে লিখিত, পরিবর্তিত ও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক রাজিতে বর্ণনার অনেক অসামঞ্জস্য।

মহাভারত বৈদিক সভ্যতার কিছু কি সংস্কৃতির ধারক মাত্র কিন্তু বৈদিক সভ্যতা থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে তার সময়টা। মহাভারতে স্বামীর স্থানে এসে সম্ভাবের জন্মদাতা হ'য়েছেন নিয়োগ প্রাপ্ত স্বামী এবং বহু স্বামীত্বও। রামায়ণে তা নেই। আর নারীহরণ করে স্বামীত্ব লাভও নেই, অথচ মহাভারতে তা আছে। তবে উভয় মহাকাব্যেই পুরোহিত তন্ত্রের প্রাধান্য সুদৃঢ় করা আছে।

পরিষ্কার ধারণা করা যায় অথর্ববেদের (১।১৬৭।৪ সূক্তে 'নর্তকী ও বেশ্যার' জীবিকা উল্লেখ রয়েছে, মহাভারতে তার রেশ চলেছে। এটা ২০।১৩৬।৫ সূক্তে মহানগ্নী তারা বলেই উল্লেখিত। আর ১০।৪০২ সূক্তে যে নিয়োগ প্রথা অর্থাৎ বিধবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর দেবরের অথবা স্বামীর স্বগোত্রীয় জাতিদ্বারা পুত্রোৎপাদনের প্রথাটি মহাভারতে কৌরব পাণ্ডবদের উদ্ভবপ্রসঙ্গে অবিকল তাই। এটা কিন্তু পরবর্তী মহাকাব্য রামায়ণের সমাজে আর্য্যসভ্যতার স্বীকৃত হয় নাই।

তবে উভয় মহাকাব্যের একটা জায়গায় শব্দগত মিল নাই, অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ছিল শব্দগত, কিন্তু অর্থগত, ছিলনা। কারণ দেবতার মধ্যে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৪।৫ এবং ২।২।৯১ সূক্তে দেখা যায় অগ্নি, বৃহস্পতি-এরা ব্রাহ্মণ বলে খ্যাপিত। কিন্তু শব্দে ব্যাখ্যাত নন।

আর ইন্দ্র, উপেন্দ্র, বরুণ, সোম এঁরা ক্ষত্রিয় এবং বসু, আদিত্য, মরুৎ এঁরা বৈশ্য আর পুষা প্রভৃতি দেবতারা শূদ্র (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।৪২ এবং—২৩—২৫ সূক্ত) মহাকাব্যের যুগে ওই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শব্দগুলি জাতিতে পরিণত হয়েছে।

এই দুটি মহাকাব্যের ধারাকে ভারতের চিরন্তন ধারা বলে ধারণ করতে গেলে আর্য্যদের সুপ্রাচীন ধারার হদিশ মিলবেই না ; কারণ আর্য্যদের প্রবাহ ধারার আদি তথ্যে 'ভারত' নামটাই তখনও হয় নাই।

সেই ইতিহাসটুকু দেখিয়ে তারপর দেখাবো সুপ্রাচীন আর্যগণ জানতেন আমরা আর্য, তবে দেবতা নই। দেবতারা গ্রহান্তরবাসী, জেট (আধুনিক ভাষায়) প্রাচীন ভাষায় কামগ বিমান বা রকেট চড়ে তাঁরা মর্তে আসেন, আকাশে দীর্ঘকাল বেড়াতে পারেন, আকাশে থাকা বিমানেই তাঁরা উৎকৃষ্ট বাসস্থান নির্মাণ করেন, মর্তে আসতে গেলেই নানান্ পোষাক পরে নামতে হয়

এই তথ্যগুলির প্রামাণ্য উক্তি দিয়ে নিবন্ধ করার আগে আর্যকালীন (প্রাক্, মধ্য ও অথর্ব যুগ) ভূখণ্ডের নাম সীমা, বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে রাখা দরকার—

সুপ্রাচীন অতীতে সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডটির একটি কোন নাম ছিল না, আর্য-সভ্যতার আদি পর্বে এশিয়া ভূখণ্ডের বিস্তৃত একটা অঞ্চলের নানান্ নাম হয়েছিল, কারণ আজকের যেখানটার নাম কাবুল, সেটায় যে জনপদের নাম ছিল তাও একটা কোন কৌম বা কুলের নামে অভিহিত হ'ত না, যেমন 'পক্ত' বা পক্তিদেশ বলে অভিহিত হ'তো যার জন্য ওখানে আজ দাবী উঠেছে 'পাক্তুন্' বলে আমরা ঘোষিত হ'তে চাই। তার পাশে ছিল কুরু, তার পাশে শিবি দেশ।

এইজন্যই মহাভারতে কুরুবংশ ও শিবি চরিত্রের কাহিনী খুব প্রাচীন বলেই উল্লেখিত। সেই

দেশগুলি পরে পাঞ্জাব বলে চিহ্নিত হয়। একেই ইরাণী পুস্তকে হপ্ত হিন্দব্ বা প্রাচীন নাম সপ্তসিন্ধব। ঋক্‌বেদের ৮।২৪।২৭ সূক্তে এটার সমর্থন পাওয়া যায়।

এরপর অনেক কাল পার হ'য়ে গেলে পর এই দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত (মনু সংহিতার ২।১৭) আরও নীচে নেমে এসে বিস্তৃত অঞ্চলের নামকরণ হয় 'ব্রহ্মর্ষি দেশ' অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুরা অঞ্চল।

এর নীচের ভূখণ্ডগুলি তখনও আর্যদের পদচিহ্নে চিহ্নিত হয় নাই কিন্তু ঢের পরবর্তীকালের বৌদ্ধ পুস্তকে এবং পুরাণগুলিতে উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণভারত ও পূর্বভারতের বহুলাংশকে নিয়ে নামকরণ হয় 'জম্বুদ্বীপ'। এই জম্বুদ্বীপ নামটা কিন্তু বৈদিক ভাবতের নয়। বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের মাঝমাঝি সময়টায় পাঞ্চাল, কাম্পল্য, কোশল, সাকেতক, কৌটক, চৈত্ররথ প্রভৃতি নামেও এই জম্বুদ্বীপের উত্তর, মধ্য ও পূর্বখণ্ডের বহু অঞ্চলকে অভিহিত করা হোতো। এগুলির কিছু কিছু উল্লেখ যজুর্বেদে, অথর্ববেদে এবং চরকসংহিতায় দেখা যায়। পুরাণেই ভরতবংশীয়দের নামের সঙ্গে জড়িয়ে এই বিশাল ভূখণ্ডকে ভারতবর্ষ বলে পরিচিত করা হয়েছে।

এসব নামে কিন্তু আরবীয় মুসলমানরা তেমন গুরুত্ব দেন না, তারা আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান এবং সিন্ধুনদের পূর্বতীরের দেশকে 'হিন্দ্ সিন্দ্' বলে থাকেন।

তাও দুভাগে ভাগ করে আফ্‌গান্, বেলুচ ও সিন্ধ্‌কে বলেন 'সিন্দ' তার পূর্বের দেশকে 'হিন্দ'।

হিন্দ থেকে হিন্দু। সত্যকথা বললে বলতে হয়, তাদের হিন্দু বা হিন্দ নামটা আমাদের কাছে গৌরবের বলে ধরে রাখা ঠিক নয়, কারণ ফার্সী-সাহিত্যে হিন্দুর অর্থ কৃষ্ণকায় এবং চোর। এটা ফিরদৌশির 'শাহনামায়' স্পষ্ট। তবে গালাগালি অর্থটি তুর্কীদের ভারত-বিজয়ের পরই গেঁথে রাখা হয়েছে।

অতএব আজকের ভারতে বসে সুপ্রাচীন বৈদিক সভ্যতার অনুশীলন খুবই শ্রমসাধ্য ব্যাপার। ঋকের (৭।১৮।৭) সূক্তে দেখা যায় অশ্বিনীকুমার ছিলেন যমজ, এবং তাঁরা দেবতাদের আশ্রিত এবং তাঁরা 'পক্তরাজ'।

সেই পক্তরাজযুগল উৎকৃষ্ট চিকিৎসক ছিলেন, তাঁরা গ্রহান্তরবাসী দেবতাদের আমন্ত্রণ পেতেন, বিমানে চড়ে দেবতাদের চিকিৎসার কাজে যেতেন, তা হলেও এঁরা এই পক্তিদেশবাসী (যেটা আজ পাক্তুন্ করার দাবী উঠেছে) আর্য, এবং আর্য বলেই দেবতা নন। তবে দেবতুল্য সম্মান পেতেন। আজও এই বৈদ্যযুগলকে নিয়ে কত পৌরাণিক কাহিনী। তা যাক্ সেই পক্তরাজদের কাহিনী ঋক্ বেদের ৮।২২।১০ এবং ৪৯, ১০, আবার ১০, ৬১।১ সূক্তে দীর্ঘতর করে বর্ণনা করা আছে।

অতএব স্পষ্ট হোলো যে আর্যরা দেবতা ছিলেন না, আর সব আর্যদের চোখে দেবতারাও সুশ্রী আকৃতি ছিলেন না, তার কারণ দেবতারা ভিন্ন গ্রহ থেকে আসতেন বলেই নানান্ পোষাক পরে আসতে হোতো, আর্যভূমির আকাশে নামতে হলে তদুপযোগী আবহাওয়ার পোষাকের প্রয়োজন অবশ্যই হয়।

সেই জন্য ঋক্‌বেদে দেবতাদিগকে শ্বেতকায় বলা হয়েছে (ঋক্ ২।২০।৮) আবার যজুর্বেদের রাজসংহিতার ১৯।৯২ ইন্দ্রকে দেখা গিয়েছে এইরূপে—

'যবা না বাহিং জ্রবি কেশরাণি, আস্থায়ুপস্থে ন বৃকাস্থ লোমা, মুখে শ্মশ্রুনি না ব্যাঘ্রলোমা, কেশা না শির্ষাস্থাসাসে শ্রিয়াই শিক্ষা সিংহস্থ লোমাত্বিসিরিন্দ্রিযাণি'।

অনুবাদ—(ইন্দ্রস্বরূপং চক্রে (মহীধরভাষ্য) অর্থাৎ ইন্দ্রের রূপ বর্ণনা করা হচ্ছে—ইন্দ্রের ভ্রূতে যব ও ঘাসের গোছার মত লোম, মুখে বাঘের লোমের মত দাড়ি, মাথার আঁচড়ান চুল অলংকৃত, সিংহের কেশরের মতই উগ্র দর্শন, তবে শক্তিমান চেহারা।

এর দ্বারা একটা কথা স্পষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের নামই ইন্দ্র ছিল না। ও নামটা আধুনিক যুগের 'প্রেসিডেন্ট' গ্রহান্তরে যাঁরা থাকতেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যিনি ঐশ্বর্যশালী। (এঁর আকাশ বিমান এবং সেই বিমানেও বাড়িঘর ছিল, রাজসভা ছিল এ পরিচয় মহাভারতে আছে, তা পরে লিখছি)

এমন ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রের এবং অন্যান্য দেবতাদের চিকিৎসা কাজে আর্যদের অশ্বিনীকুমারও গ্রহান্তরে যেতেন। এবং যেতেন বিমানে চড়ে। যজুর্বেদে এমন বিমান যানের সংবাদ দেওয়া রয়েছে।

'বিমান এষ দিবো মধ্য আস্ত আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরিক্ষম্।

স বিশ্বাচী রভিচষ্টে ঘৃতাচী রন্তরা পূর্বমপরং চ কেতুম্ (যজুর্বেদ ১৭।৫৯)

এই সূক্তিটি ঋক্‌বেদের কয়েকস্থানেও আছে (ঋক ৯।২।৩ এবং ১৪।১২) মহীধর উভয় বেদের এই সূক্তির ভাষ্যে বলেছেন 'এষো বিমানঃ আদিত্যলোকস্থ অন্তরিক্ষস্থ মধ্যে আস্তে তিষ্ঠতি' দ্যুলোকঃ ভূর্লোকঃ তয়োর্মধ্যে স্থিতত্বাৎ দিবো মধ্যে আস্তে। কীদশঃবিমানঃ অন্তরিক্ষং আপপ্রিবান্ তেজসা সর্বতঃ পূরিতবান্, প্রা পূরণে সুপ্রত্যয়ঃ। বিশ্বাচী ঘৃতাচী অভিচষ্টে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পূর্বং অপরং চ কেতুং উদয়াস্তময়ং আস্তে।'

অর্থাৎ এই বিমান সূর্যের তেজের মধ্যে অন্তরীক্ষে অবস্থান করে, দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে গমন করে, অবস্থান করে। কিরূপ বিমান ? এটি সূর্যের তীক্ষ্ণ তেজের মধ্যে প্রবেশ করে, সূর্যতেজে পূর্ণ হয়ে যায়, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচীর অভিলাষ পূর্ণ করে। (ঘৃতাচী বিশ্বাচী নাম দুটি বহুস্থলে চিরনবীনা লাস্যময়ী রমণীকেও বোঝায়) এই বিমান ব্রহ্মাণ্ডের উদয়াস্ত কাল অবস্থান করে, অর্থাৎ মহাকাশে অবস্থানকালে একটি গ্রহের উদয় অপর একটি গ্রহের অস্তকাল দেখে।

বেদের এই বিমানের অবস্থান সম্পর্কে আজকের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধিবাসিদের মনে কোন কল্পনার বস্তু বা মনোভিলাষের বিষয়মাত্র নয়, মহাকাশচারীরা তা প্রত্যক্ষ করিয়ে দিচ্ছে। বেদে তেমনি মহাকাশচারী বিমানের কথাই বলা হয়েছে এবং গ্রহ থেকে গ্রহান্তর যাবার জন্য যে ধরণের বিমানের প্রয়োজন তারও অস্তিত্বের কথাই বলা হয়েছে, তা ছাড়া সে বিমানে অবস্থানকারিরা যে এক গ্রহের উদয় অপর গ্রহের অস্ত দেখতেন তাও বলা হয়েছে। আজ তার নব সংস্করণ 'আর্যভট্ট' দিয়ে কিছুটা বাস্তবের রূপ নিয়েছে।

এরপর, মহাভারতের কাহিনী দিয়ে বৈদিক সূক্তির সমর্থন দেখাই—

প্রথম সুরু করা যাক মহাভারতের আদি পর্বের ৬৩ অধ্যায়ে রাজা উপরিচরের প্রসঙ্গ ধরে, ওখানে বলা হয়েছে সুপ্রাচীন পুরুবংশে উপরিচর নামে এক রাজা ছিলেন, তার এক নাম বসু। খুব

সংগ্রামী পুরুষ, বাহুবলে চেদি রাজ্যটি দখল করে নেন। অর্থাৎ আজকের ছোট নাগপুরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে একেবারে মহীশূর পর্যন্ত।

কিছুদিন রাজ্য সুখভোগ করে তপস্যায় মন দিলেন। তার তপস্যাটা নিশ্চয় মোক্ষলাভের উদ্দেশ্য নয়, নূতন করে বল সঞ্চয়, হয়তো বা বিরাট কিছু জয় করার ফন্দি। এই ভেবে ইন্দ্র এলেন তাঁর কাছে। বললেন 'ওহে চেদিরাজ! তোমার তীব্র তপস্যায় আমার খুব সন্তোষলাভ হয়েছে, সেই তৃপ্তির একটা উপহার দিই তোমায় কোন! তোমাকে এমন একটা বিমান দিচ্ছি, যেটায় চড়ে দেবতাদের মত মর্তলোকের সবাইকে দেখতে পাবে, মানুষগুলোর চলাফেরা কেমন তা দেখতে পাবে, এবং শুধু মানুষের মধ্যে কেন, যে কোন লোকে গিয়ে তাদের কি কি ঘটনা ঘটছে তাও দেখতে পাবে, ঠিক দেবতারা যেমন আকাশে ভ্রমণ করে বেড়ান তেমনিই তোমার সব প্রত্যক্ষ হবে—

> ন তে ইস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু যদ্ভবেৎ।
>
> দৈবোপভোগ্যং দ্বিব্যংত্বং আকাশে স্ফটিকং মহৎ॥
>
> আকাশনাং ত্বাং মদ্দত্তং বিমানং উপপৎস্যতে।
>
> ত্বমেকঃ সর্বমর্তেষু বিমান বরমাস্থিতঃ।
>
> চরিষ্যস্যু পরিস্থোহি দেবো বিগ্রহবানিব॥

ইন্দ্রের সেই বিমানটি পেয়ে 'উপরি চর' আর মাটিতে থেকে রাজ্য করার বাসনা করলেন না, ওই আকাশেই থাকতেন। আহার, বিহার আমোদ প্রমোদ সবই তাঁর চলতে লাগলো সেই আকাশচারী বিমানে থেকেই।

ইন্দ্রও আসতেন আর একটি বিমানে, এসে উপরিচরের সঙ্গে দেখা করে এই মাটিতেও ভ্রমণ করতেন।

মহাভারতকার লিখেছেন সেই সময় ইন্দ্র একটি হংসের রূপ ধারণ করে নামতেন

> ধরণ্যাং পূজ্যতে চাত্র হংস রূপেণ চেশ্বরঃ।

অর্থাৎ মহাকাশচারী ইন্দ্র যখন পৃথিবীতে নামতেন তাকে ঠিক একটি হাঁসের মতই লাগতো।

এর অর্থ খুব স্পষ্ট, মহাকাশে ভ্রমণের জন্য দেহরক্ষার প্রয়োজনে পোষাক অবশ্যই বদলাতে হ'তো। সে পোষাক পরলে হাঁসের মত লাগতো।

এই সব শ্লোকে বোঝা যায় সমগ্র মাটির জগতের রাষ্ট্রগুলির হাল চাল জানতে গ্রহান্তরের দেবতাদের আগ্রহ কম ছিল না, এবং জানার আগ্রহের সঙ্গে কর্তৃত্ব রক্ষা করার শক্তিও কম ছিল না, এই উভয়বিধ কাজের রক্ষাভারের জন্য আরও একজন মহাকাশচারী গুপ্তচরের প্রয়োজন ছিল বলেই উপরিচারকে আকাশচারী করার তাগিদ ছিল ইন্দ্রের। এমনি গুপ্তচর আরও একজন ছিলেন, তাঁর নাম নারদ। তিনি সর্বদা যাতায়াত ক'রতেন আকাশচারী বিমান বাহনে। তিনি গ্রহান্তরের বাসিন্দা দেবতাদের সব খবর রাখতেন, তাঁদের সঙ্গে রীতিমত মেলা মেশা করতেন, মর্তের মানুষের খবরও ও পৌছে দিতেন।

এ সংবাদ আমরা পাই মহাভারতের সভাপর্বের ৭ম অধ্যায় থেকে অর্থাৎ বিশাল খাণ্ডব বনটি পুড়িয়ে সেখানে বিরাট শহর গড়ে তুললেন শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব। স্থপতি ছিলেন ময় নামে কোন

বৈদেশিক শিল্পী। হয়তো এটাই ঠিক আমেরিকার মায়া সভ্যতার সেও একটা আদি অভিজ্ঞান। সেই বিশিষ্ট স্থপতির অক্লান্ত শ্রমেই গড়ে উঠেছিল যুধিষ্ঠিরের রাজপ্রাসাদ। তারই অভ্যন্তরে নির্মিত হয়েছিল রাজসভা বা পার্লিয়ামেন্ট হাউস। তৎকালে অমন সভা গৃহ ভারতের অন্যত্র ছিল না। দেবদূত নারদ এসেছিল তা দেখতে। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে আপনি তো অপ্রতিহতগতি পুরুষ, দেবলোক, মর্ত্তলোক ভ্রমণ করে বেড়ান আমার এই সভা গৃহের মত আর কোথাও কি দেখেছেন?—নাকি এর চেয়েও ভাল কোন সভাগৃহ আছে কোথাও?'

ঈদৃশী ভবিতাকাচিৎ দৃষ্ট পূর্বা সভা ক্বচিৎ।
ইতো বা শ্রেয়সী ব্রহ্মন তন্মমা চক্ষ পৃচ্ছতঃ।

নারদ শুনে মৃদুহেসে উত্তর দিলেন 'স্মযন্ মধুরয়া গিরা।

হ্যাঁ মহাশয়, আপনার সভাগৃহের মত এমন বাড়ি মনুষ্য লোকে দেখিনাই তবে দেবতাদের সভাগৃহে দেখেছি। সে আরও বিস্ময়কর। মানুষ সভাগৃহ তৈরী করে মাটিতে আর দেবতারা করে আকাশে এবং তা চলমান। সেটিকে আকাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, দেবলোকের বহু ব্যক্তি সেখানে আসা যাওয়া করেন, বাস করেন আমোদ প্রমোদ করার সব যা যা দরকার সব তাতে মজুত করা থাকে সে এক বিস্তীর্ণ আকাশ জুড়ে অবস্থান করা সভা গৃহ। ইন্দ্রের সভাগৃহের কথাই বলি—এটি নির্মাণ করেছেন বিশ্বকর্মা। পঞ্চযোজন দীর্ঘ শতযোজন বিস্তৃত এই বিমানসভা—

বৈহায়সী কামগমা পঞ্চযোজন মুচ্ছ্রিতা।
জরাশোক-ক্লমাপেতা নিতাতৃপ্তা শিবা শুভা॥

ওতে আছে বসার জায়গা, শোবার জায়গা এবং নানান্ গাছ পালাও লাগান—

বেশ্মাসনবতী রম্য দিব্যপাদপ শোভিতা।

ওই আকাশচারী বিমানের সভাগৃহেই মহেন্দ্র থাকেন তাঁর পত্নী শচীকে নিয়ে; কত সুন্দরী রমণী ওখানে থেকে নাচ গানের দ্বারা খুসী করেন দেবেন্দ্রদম্পতীকে। ওই বিমানে থেকেই আবার সংগ্রাম ও করেন ইন্দ্র। ওখান থেকেই সংগ্রাম করেই বৃত্রাসুরকে তিনি হত্যাও করেছিলেন—

তত্রৈবপ্সাসরসো রাজন্ গন্ধর্বশ্চমনোরমা
নৃত্যগীত বা দিত্রৈশ্চ হাস্যৈশ্চ বিবিধৈরাপি।
রময়ন্তি স্ম নৃপতে দেব রাজং শতক্রতুম্।
বলবন্তং বৃত্রাসুরং স্থিতস্তত্রৈব বাসবঃ।
জঘান বিবিধৈ দিবৈ রসৈ চন্দ্র সঙ্কাশরশ্মিভিঃ

মহাশয়। আর একটি বিমান সভার বর্ণনা শুনুন। এ সভাটি বৈবস্বত যমের সভা। এঁর সভাগৃহটিও বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছেন এবং সেটিও ঐ আকাশে আকাশেই ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান তিনি। গগনচারী সেই সভা গৃহেই চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আহার্য্য থাকে, এবং শীত উষ্ণ জলেরও ব্যবস্থা সর্বদা। সেই আকাশচারী সভাটির বর্ণ একেবারে সূর্যকিরণের সঙ্গে এক।

তৈজসী সা সভা শুভ্রা কামগা কাশ চারিণী।
অর্কপ্রকাশর ব্রাজিষ্ণুঃ সমর্থঃ কামরূপিণী।

নাতি শীতা ন চাত্যুষ্ণামনশ্চ প্রহর্ষিনী।

নারদের বর্ণনা এখানেই থামেনি, তিনি মহাকাশে আরও যাঁদের বিমান সভা দেখেছেন তাদের মধ্যে বরুণ এবং কোনও কুবেরের সভাও দেখেছেন। তারপর শেষ প্রসঙ্গে এসে যে সভার কথা বল্লেন সেটি সর্বাধিক বিস্ময়কর। দেবতারা যে গ্রহান্তর থেকে এই মর্তলোকে আসতেন এবং তখন তাঁরা মর্তের মানুষের আকৃতি ধরেই আসতেন এটা স্পষ্ট করে বললেন। অর্থাৎ মহাকাশে থাকার সময় সে সব পোষাকে এলে মর্তের মানুষ কি ক'রতেন তা না বললেও নারদ বলেছেন ওরা মর্ত্যে এলে মানুষেরই বেশ পরিধান করতেন। এমনি প্রসঙ্গে অবতারণা করে নারদ বললেন—

পুরা দেবযুগে রাজন্ আদিত্যে ভগবান্ দিবঃ।
আগচ্ছন্ মানুষং লোকং দিদৃক্ষু বিগতক্লমঃ।
চরন্ মানুষ রূপেণ মর্ত্য দৃষ্টা পুনঃ শুভাম্।
বৈহায়সীসভাং দিব্যাং আগচ্ছং চ দিবস্পাতিঃ।

গ্রহান্তর থেকে দেবতাদের আসা-যাওয়া যে সব বৈমানিক বিজ্ঞানের দ্বারা ঘটতো, পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের সেই সব অদ্ভুত রহস্যবিদ্যাগুলিকে সঞ্জীবিত করে রাখার চেয়ে ও বিদ্যাকে যৌগিক বিদ্যারই রূপক বলে বর্ণনা করার যে ছাপ আমাদের সংস্কারে জাগরূক হয়ে আছে তার একটু নমুনা দিই—

গ্রহান্তর থেকে আসা যাওয়াকে মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ মহাভারতেরই লোকসভা পর্বের ১১দশ অধ্যায়ের টীকায় বলেছেন—

দেবযুগে কিনা কৃতযুগে। এবং মানসীং ইত্যনেন ভৌতিকত্ব ব্যাবৃত্তিঃ। আতি বাহিক এব ময়ং ত্বাবদৃশৈশ্চিত্তদেহকঃ। অভিলাষঃ সংকল্প, ইন্দ্রাদিলোক রূপে স্বর্গে। তত্র চিত্তমেব, তদিদং চিত্তদেহক ইতি। তাদৃশী প্রজাপতি সভা মানসতু যুক্তম্।

অর্থাৎ এই যে দেবযুগ, স্বর্গলোক, আকাশ বিমানের সভা এসব কিন্তু চিত্তের সংকল্প, এসব সংকল্প এই দেহের চিত্তের মাধ্যমেই যোগ প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে, অতএব চিত্ত ও দেহ সম্পর্ক নিয়েই মহাভারতীয় লোকসভাগুলির বর্ণনা। আসলে সূক্ষ্মভূতময় আতিবাহিক দেহেরই বর্ণনা।

টীকাকার নীলকণ্ঠের এই বাস্তব পরিহার ব্যাখ্যাটি পাতঞ্জল প্রভৃতি যোগশাস্ত্রের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করেই। তারফলে আমাদের দেশে কতকাল আগে থেকে ব্যবহার বিজ্ঞানটির চর্চা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সে ইতিহাসের পুনরুজ্জীবন যাঁরা করতে যাবেন তাঁদিকে বলা হবে ডঃ দ্রানিকেনের স্তাবক, প্রাচ্যচিন্তাবিলাসিক। পাশ্চাত্যদেশের প্রশস্তিকার। বাস্তবধর্মী নাস্তিক। এর জন্য তাঁরা বেদের সূক্তির ব্যাখ্যাও দেবযান, পিতৃযান, যমযানের অতি বাস্তবতা দেখান। অলমিতি। মোটকথা ইতিহাস রচনার অঙ্গসীমার অনেক আগে থেকেই এই ভারতের মানুষ ভগবান গড়ার চেয়ে মানুষের ব্যবহার বিজ্ঞান জানার চেষ্টাকে ধর্মীয়নিদ্রার কোলে যেতে সাহায্য করে চলেছে, এমনটি কিন্তু আর্য-ভারতে হয়নি।

লৌকিক দেবদেবী ও গ্রামীণ জীবনচর্যা

রেবতীমোহন সরকার

গ্রাম বাংলায় লৌকিক দেবদেবীর অন্ত নেই। গ্রামের পথে-ঘাটে, বিশাল-প্রান্তরে, শস্যক্ষেত্রে অথবা জটাজুটধারী বটবৃক্ষতলে গ্রামীণ দেবদেবী আসন পেতেছেন। পুরাণবর্ণিত দেবদেবীর তালিকায় এঁদের অনেককে দেখতে পাওয়া যাবে না, আবার কেউবা সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত, কেউবা হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। কোন কোন লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চনার মধ্যে নানা জাতীয় বিশ্বাস ও সংস্কার পরিলক্ষিত হয়। প্রাক্‌বৈদিক এবং বৈদিক রীতি-নীতির সংঘাত-সমন্বয়ের চিত্র ফুটে উঠে বহু লৌকিক দেবদেবীর নানা আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে। কোন লৌকিক দেবদেবী উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—ব্রাহ্মণ পুরোহিত এদের পূজার্চনার ভার গ্রহণ করেছেন এবং অতি স্বাভাবিকভাবেই এই সকল দেবদেবীর মধ্যে পৌরাণিকত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। আবার বহু লৌকিক দেবদেবী এখনও রয়েছেন হিন্দুসমাজের অন্ত্যজশ্রেণীর ঘরে ঘরে এরা নিজেরাই দেবদেবীর পূজারী, নিজেরাই তাঁদের পূজার্চনার ব্যবস্থাপক। আবার এই দুইয়ের মাঝখানে রয়েছেন আরও কিছুসংখ্যক দেবদেবী। এঁদের পূজা করে নিম্নবর্ণের মানুষ—কখনও কখনও তারা বৃহত্তর হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

মানব-সমাজে যুগে যুগে ধর্মের বিস্তৃতরূপ পরিলক্ষিত হয়। ধর্মের অন্তর্নিহিত ভাবধারাও বহুমুখী। কিন্তু আদিম সমাজে ধর্মের মূলগত লক্ষ্য ছিল একটি—সমাজধারা নিয়ন্ত্রণ। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নানা সমস্যা ও প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে মানুষ তার স্বকল্পিত ও স্বপ্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর নিকট আবেদন জানিয়েছে। সমাজ নিয়ন্ত্রণের নানা বিধয় আজও বিভিন্নরূপী ধর্মীয় আচারআচরণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে সেই উদ্দেশ্য বিশেষভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে লোকজীবনের বিস্তৃতরূপ প্রকাশ পায়। গ্রামীণ সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি এমন কি অর্থনীতিক জীবনের চত্বরেও প্রধান দেবদেবীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই ভাবধারার উপর ভিত্তি করেই প্রখ্যাত আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী মিলটন সিঙ্গার আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটি এবং আমেরিকান অ্যানথ্রোপোলোজিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় সমাজ ও লোককর্ম এবং উৎসবের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নির্ভরশীলতা বিষয়ে রীতিবদ্ধ আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় লোকবিশ্বাস ও সংস্কার এবং বৃহত্তর হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত নানা বিশ্বাস ও সংস্কারের পারস্পরিক আদান প্রদানের এক বিস্তৃত অনুসন্ধানের দিকটি তুল ধরেছিলেন। ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের সাথে বৃহৎ ঐতিহ্যের মহামিলনক্ষেত্র এই ভারতের বুকে যুগে যুগে সংঘাত ও সমন্বয়ের ধারা রচিত হয়েছে—এর প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ রূপ আজিও নানা আচার অনুষ্ঠানের মাঝে জাজ্বল্যমান।

এই জাতীয় চিন্তাধারার পশ্চাৎপটে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীসমূহের নানা আচার অনুষ্ঠান ও গতি-প্রকৃতির মূল্যায়ণ করা হলে সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনার এক বিশেষ দিগন্ত

উদ্ভাসিত হবে। লৌকিক দেবদেবীদের উৎস এবং এদের মধ্যে আর্য-অনার্য সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মিলন-বিচ্ছেদের বহু আলোচনা বিভিন্ন পণ্ডিত করেছেন; কিন্তু লোকজীবনের কেন্দ্রভূমিতে এসে এগুলোর সার্বিক আলোচনার কোন বিশেষ প্রবণতা দেখা যায় নি। গ্রামজীবনের নানা অধ্যায় উন্মোচন কালে এই লৌকিক দেবদেবীর প্রত্যক্ষপ্রভাব আলোচনার বিশেষ দাবী রাখে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রামজীবন আলোচনার এক বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়াছে। সমাজ বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয় ধারাতেই গ্রামীণ জনজীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোক সম্পাতের প্রচেষ্টা আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি।

বাংলার গ্রামজীবন কৃষি ভিত্তিক। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বিভিন্ন সামাজিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি জাতির কৌলিক বৃত্তি ভিত্তিকতা বিশেষভাবে প্রকটিত। উচ্চ-নীচ বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস এই জাতিগুলির মধ্যে রয়েছে। ব্রাহ্মণশীর্ষক এই সমাজে অজস্র জাতি গোষ্ঠী নানা স্থান অধিকার করে আছে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার অস্পৃশ্য হিসাবে পরিগণিত—ব্রাহ্মণ পুরোহিতও এদের সমাজে পূজার্চনার কোন কাজই করেন না। অনেক সময় নিম্ন শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণেরা এদের সমাজে পুরোহিত হিসাবে কাজ করেন অথবা অধিকাংশ সময়েই এঁরা পূজার্চনার কাজ নিজেরাই করে থাকেন। ব্রাহ্মণ শাসিত তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার বর্ণবিভাগগুলির মধ্যে কড়া অনুশাসন ছিল। নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা কোন ক্রমেই উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসবার অধিকারী ছিলেন না। নানা সামাজিক বিধি নিষেধের বেড়াজালে বিভিন্ন জাতির অবাধ বিচরণ নিয়ন্ত্রিত হত।

বাগদি, বাউড়ী; ডোম, মুচি, হাঁড়ি প্রভৃতি তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা বাংলার জনজীবনে এক বিশেষ ধারা বহন করে চলেছে। আজকের গ্রাম বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজে এঁরা মূলতঃ কৃষির নানা কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন তাছাড়াও এঁদের পেশা এখনও কেউ কেউ আঁকড়ে ধরে আছেন। তবে সেটা পুরোপুরিভাবেই পরিপূরক বৃত্তি হিসাবেই বহুযুগের ওপারে যেতে হবে। প্রাক্‌-আর্য সংস্কৃতির নানা ধারার সন্ধান এদের জীবনচর্যার মধ্যে মিলবে। এমন সব ঘটনা বিচিত্রার সন্ধান পাওয়া যাবে যার মধ্যে এইসব জনজাতির অনার্য সংস্কৃতি প্রমাণিত হবে। কালের প্রবাহে এবং হিন্দুসংস্কৃতির চলমান ঢেউএর প্রচণ্ড তোড়ে এদের স্বকীয়তা হারিয়ে গিয়েছে এবং ধীর পদক্ষেপে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের এক কোণে স্থান করে নিয়েছে। বৃহৎ ঐতিহ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের আত্মীকরণ হারিয়ে যায়নি অথবা বৃহৎ ক্ষুদ্রকে গ্রাস করে ফেলেনি। বৃহৎ ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক রূপরেখার সাথে ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের সম্ভারপূর্ণ মিলন ঘটেছে। তবে দ্বন্দ্ব-সংঘাত যে ঘটেনি তা নয়—কখনও সংঘাত ঘটেছে তীব্রভাবে, কখনও অতি মৃদুতার মধ্যেই তা সীমায়িত থেকেছে। ধীরে ধীরে সেই বিদ্বেষভাব অন্তর্হিত হয়েছে—কখনও তার ক্ষীণ স্রোত প্রবলাকার ধারণ করেছে অনুকূলতার স্পর্শে হয়েছে শ্রেণীসংঘাত, জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ গ্রামীণ পরিবেশের শান্তি বিঘ্নিত করেছে।

বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত, বিপরীতধর্মী আচার আচরণ এবং জীবনরীতি সম্বলিত গ্রামীণ সমাজ বহু বিচিত্রতায় ভরা। এই বৈচিত্র্যের মাঝেই ধ্বনিত হয় ঐক্যের সুর। সেই সুরের প্রকৃত প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে গ্রামীণ দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি এবং সেই সূত্রে গ্রামীণ মানুষের

আচার অচরণের মধ্যে। এই সকল লৌকিক দেবদেবীর পূজায় জাতিবর্গ নির্বিশেষে গ্রামীণ সকলেই প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করে। পূজার্চনার বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রামীণ মানুষের আচার আচরণের মাধ্যমে গ্রামজীবনের এই স্বতঃস্ফূর্ত ছবি ফুটে উঠে—এই ছবির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং মূলগত দিকগুলির আলোচনার সাহায্যে গ্রামীণ জীবনচর্চার একটি বিশেষ ধারা উদ্বেলিত হবে। লৌকিক দেবদেবীর, আলোচনা এবং তার বিভিন্ন পর্যায়ে জনমানসের সম্পর্ক ধারা খুঁজতে গেল নিম্নবর্ণিত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে হবে।

(ক) লৌকিক দেবদেবীর উৎপত্তি এবং বিশিষ্ট লক্ষণাবলী

(খ) দেবত্বের প্রকৃতি এবং পূজার্চনার নমুনা

(গ) পূজায় বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর কর্মধারার রূপ

(ঘ) লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোক চিকিৎসা

(ঙ) সামাজিক ঐক্যভাব প্রতিষ্ঠায় লৌকিক দেবদেবীর ভূমিকা

উপরিউক্ত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই প্রসঙ্গটির অনুধাবনে বিশেষ সাহায্য করবে।

(ক) লৌকিক দেবদেবীর প্রকৃত রূপটিকে উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। মূর্তির কোন বিশেষত্ব থাকলে তা দেখতে হবে। অধিকাংশ দেবদেবীর প্রতিষ্ঠিত এবং পূজাপ্রাপ্তির ইতিহাস বিবৃত করে নানা লোককথা। সেগুলির যথাযথ সংগ্রহ প্রয়োজন এবং সংগ্রহান্তে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত বিশ্লেষণ করে প্রাক্‌বৈদিক ও বৈদিক সংস্কৃতির পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাত এবং আত্তীকরণ প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করতে হবে।

(খ) লৌকিক দেবদেবীর দেবত্বপ্রতিষ্ঠার জন্যে নানা মাধ্যম পরিলক্ষিত হয়। কোন বিশেষ লোকদেবদেবীর অসাধারণ ক্ষমতা বিবৃত করে লোকমুখে বহু গল্প, প্রবাদ, প্রবচন ছড়িয়ে থাকে। নানা লোককথায় এমন বিষয়ও আছে যে বিশেষ লোক দেবদেবীর প্রতি সামান্যতম অনাগ্রহও সর্বনাশ ঘনিয়ে আনতে পারে। তাই মানুষ সশ্রদ্ধ এবং ভয় মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকায় ঐসকল দেবদেবীর প্রতি। না জানি কোথায় কি ক্ষতি তাঁরা করে ফেলতে পারেন। বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর বার্ষিক উৎসবের সময় জাতিবর্গ নির্বিশেষে সকলে যোগ দেয়। যে দেবদেবীর এখনও ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত হননি তাঁদের ক্ষেত্রে নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা প্রত্যক্ষভাবে পূজো দিয়ে যাচ্ছেন—এবং এরজন্যে কোনরকম সমাজ-ধর্ম মূলক প্রতিবাদ বা অসহযোগিতার ভাব পরিলক্ষিত হয় না।

(গ) গ্রামে নানা জাতির বাস—প্রতিটি জাতির নিজস্ব অনুশাসন, চিন্তাধারা এবং রীতিনীতি রয়েছে। এই জাতিগুলির মধ্যে কেউ উঁচু কেউ নীচু। সাধারণতঃ গ্রামীণ বৃহত্তর হিন্দুধর্ম প্রবাহিত দেবদেবীর পূজায় নিম্নসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের কোন স্থান নেই। সকল সময়েই এদের দূরে দূরে থাকতে হয়—এমনকি মন্দির চত্বরেও এদের প্রবেশ নিষেধ। অথচ লৌকিক দেবদেবীর পূজায় এরা প্রধান হোতা। ব্রাহ্মণও পূজো নিয়ে আসছেন এবং নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মাধ্যমেই দেবতাদের কাছে পূজো নিবেদন করেছেন। এই পরিস্থিতি একটা কথাই প্রমাণিত করে যে কোন এক সময়ে জাতিভেদ প্রথার দৃঢ়তা শিথিল হয়ে যাচ্ছে এবং কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষের পরিচয় চিহ্নিত হচ্ছে। অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজ সেই মুহূর্তে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

(ঘ) লৌকিক দেবদেবীর থানে নানা ওষুধ দেওয়া হয়। দেবতার দেয়ানী পুরুষানুক্রমে নানা রোগের ওষুধ দিয়ে থাকেন। দলে দলে মানুষ আসে এই সকল দেবদেবীর স্থানে। যুগ যুগ ধরে এরা আসছে দেবতাদের সামনে, মানত করছে আর ভক্তিভরে গ্রহণ করেছে গাছ-গাছড়া, তেল এমনকি দেবতার থানের মাটি। গ্রামে মহামারী দেখা দিলে কখনও বা ভিন্ন গ্রামের গ্রামদেবীকে সাড়ম্বরে নিয়ে এসে পূজা করা হয়। এক একটি গ্রাম দেবদেবীর রয়েছে বহু শাসনের গ্রাম। অর্থাৎ ঐ বিশেষ দেব বা দেবী ঐগুলির মঙ্গলের সর্বময় কর্তা বা কর্ত্রী। বছরের বিভিন্ন সময়ে দেয়ানীর মাধ্যমে তিনি ঘুরে বেড়ান ঐ সকল গ্রামে আর জনমানসের পূজো গ্রহণ করেন। প্রতিটি গ্রাম প্রায় উৎসব মুখর হয়ে উঠে—মানুষে মানুষে যেন নতুন সম্পর্ক রচিত হয়।

(ঙ) সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে লৌকিক দেবদেবীর সর্বপ্রধান ভূমিকা হল সামাজিক দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, নীচতা হীনতা ভুলে গিয়ে ঐক্যভাব জাগিয়ে তোলা। লৌকিক দেবদেবীর পূজা অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে নানাজাতির লোক নিযুক্ত থাকতে দেখা যায়। এরা পুরুষানুক্রমে কাজ করে যাচ্ছেন এবং সম্মানিত পারিশ্রমিক গ্রহণ করে চলেছেন। পূজোর প্রাক্কালে এবং পূজোর সময় সমগ্র গ্রামে বিধিনিষেধ মানা হয় আর জাত্যাভিমান ভুলে গিয়ে একযোগে নানাকাজ করা হয়। গ্রামের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনই এর প্রধান উদ্দেশ্য। গ্রামজীবনের ধারা, মানুষের মনের গতিশীলতা, কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মপদ্ধতির বিকাশ, পারস্পরিক ঐক্যবোধ এবং সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির প্রকৃত রূপের বিশ্লেষণে লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক নানা আচার অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ অবলোকন এবং মূল্যায়ণ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। মানুষের প্রয়োজনেই এই সব দেবদেবীর স্থাপনা। গ্রাম সমাজের প্রতিটি পদক্ষেপে এঁদের প্রভাব রয়েছে—মানুষের সমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে এঁরা স্বীকৃত। তাই গ্রামীণ জীবনচর্যার একটি সার্থক রূপের বিকাশ সাধনে লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চনাকেন্দ্রিক গ্রামীণ মানুষের আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার এবং অজস্র প্রবাদ-প্রবচন ও লোককথার সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা, পারস্পরিক সম্পর্ক তথা নির্ভরশীলতার প্রকৃতি পর্যালোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এতদ্ব্যতীত লোকধর্ম ও বৃহত্তর সনাতন হিন্দুধর্মের বিভিন্ন রূপরেখার পারস্পরিক আদান প্রদান এবং ঐক্যের মধ্যে অপরের নানা বিশ্বাস ও সংস্কারের অবাধ সঞ্চারণ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে এইসব লৌকিক দেবদেবী সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষুদ্র লৌকিক ঐতিহ্যের সাথে বৃহত্তর সনাতন হিন্দুধর্মীয় ঐতিহ্যের এই মহামিলনে ভারতের বুকে সতত উজ্জ্বল এবং সেই ঔজ্জ্বল্যের প্রতিচ্ছবি বুকে ধারণ করে গ্রামের মাঠে ঘাটে অসংখ্য লৌকিক দেবদেবী বিরাজমান। লৌকিক দেবদেবীর উৎস, এদের পূজাপদ্ধতি অথবা এদের মাহাত্ম্য বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু যাদের জন্য এই লৌকিক দেবদেবীর অধিষ্ঠান সেই লোকজীবনের কেন্দ্রভূমিতে স্থাপন করে লৌকিক দেবদেবীর আলোচনা একেবারে হয়নি বললেই হয়। লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চনার বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রকরণের সার্বিক পর্যালোচনা এবং আন্তঃস্তরীণ গতিবিধির বিশ্লেষণের মাধ্যমে জনজীবনের মূলগত তাৎপর্য বহুলাংশে উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। গ্রামীণ মানুষের জীবনচর্যার একটা বিশেষ দিক এর সাহায্যে প্রতিফলিত হওয়ার বিশেষ একটা সুযোগ রয়েছে।

অনবদ্য শোলা-শিল্প

মঞ্জুলা সরকার

কাগজের থেকেও হাল্‌কা যে বস্তুটি তালপাতা, কাপড় অথবা কাগজের পরিবর্তে চিত্ররচনার জমি হিসেবে সর্বতোভাবে উপযুক্ত, তাহল শোলা।

শোলা হল অত্যন্ত হাল্‌কা দুধ সাদা এক জাতীয় জলজ উদ্ভিদ। পাতলা খয়েরী ছাল দিয়ে আচ্ছাদিত শোলাগাছ আসাম এবং বাংলার জলাভূমিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। সাধারণতঃ শোলার কোন চাষ হয় না, এ এক অযত্ন-বর্দ্ধিত উদ্ভিদ। নদীয়া জেলার বটের বিলে একসময়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শোলা জন্মাতো।

শোলাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'এসচাইনো মেনে এসপেরা' অথবা 'লিন্'। কিন্তু এই বস্তুটি তুলনামূলকভাবে 'পিথ' নামেই বেশী পরিচিত। শোলাগাছের ব্যাস কখনো কখনো ৪ ইঞ্চি থেকে ২০ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। জল থেকে সংগ্রহ করে শোলাগাছগুলিকে রোদে শুকিয়ে নিয়ে পরে প্রয়োজন মত ছোট ছোট টুকরো করা হয়ে থাকে। পাতলা অথচ খুব ধারালো ফলাবিশিষ্ট যে যন্ত্র দিয়ে শোলা মাপমত কাটা হয়, তার নাম কাথ। কাথ তিন রকমের হয় যথা—ধোসা, কালসো আর ইস্ত্রি। আর লাগে নানা মাপের লোহার কাঁটা। বলা বাহুল্য ঐ সব যন্ত্র বাংলার কর্মকারদের তৈরী।

শোলার পাতলা পাতলা পর্দা বা স্তরকে বলা হয় 'কাপ', আর খণ্ডগুলিকে বলে 'পাতুরি'। শোলার একেকটি পাতলা পাত বা স্তর ৬ থেকে ১০ ফিট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। আবার প্রয়োজন হলে একটি পাতের সঙ্গে আরেকটি জুড়ে ২০ থেকে ৩০ ফিট পর্যন্ত লম্বা করা যায়। সেটিকে দেখতে লাগে ঠিক গোটানোর ফিল্মের মত।

বাংলার সনাতন শিল্পধারায় শোলার দুটি শিল্পরূপ চোখে পড়ে, একটি চিত্রিত অপরটি মণ্ডিত। 'কাপ' নামে পরিচিত বিলের মত গোটানো শোলা স্বচ্ছন্দে কাগজের মত ব্যবহার করা যায়। শোলার ওপর রঙের কাজও হয় খুব ভাল কারণ এতে সহজে রঙ ধরে এবং স্থায়ী হয়।

শোলার বুকে ছবি আঁকার রেওয়াজ খুব বেশী আছে আসামে বিশেষতঃ গোয়ালপাড়ায়, উত্তর-বঙ্গের তরাই অঞ্চলে, পূর্ববাংলার ঢাকা, ময়মনসিং এবং কুমিল্লায়। শোলার ওপর চিত্ররচনা যে পশ্চিমবঙ্গেও একটি উল্লেখযোগ্য চারুশিল্প, 'মনসা মেড়' তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

'মনসা মেড়' বা 'করণ্ডি' চিত্রিত শোলার সুন্দর নিদর্শন। বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের লৌহবাসর গৃহের সম্ভাব্য প্রতীক এই করণ্ডি সর্পপূজার এক বিশেষ অঙ্গ। শোলার তৈরী ঘরের আকৃতিবিশিষ্ট করণ্ডি দু' ফিটের মত উঁচু হয়। এর মাথার চাল ত্রিকোণাকৃতি এবং ঢালু। করণ্ডির একদিকের দেওয়ালে সর্পদেবী মনসা আর বেহুলা-লক্ষীন্দরের প্রতিকৃতি আঁকা থাকে। পূর্বে সম্ভবতঃ করণ্ডির সর্বাঙ্গই চিত্রিত হত। ছবির বিষয় সর্বত্রই এক, শুধু অঞ্চল বিশেষে নক্সা আর আঁকার ঢঙে কিছু পার্থক্য আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কারো কারো মতে করণ্ডি হল গুহামন্দিরের প্রতীক। কেউ একে শস্যাগারের প্রতীকও মনে করেন। কারণ বাংলায় মাড়াই আর কোড়াই এই দুই ধরণের শস্যাগারের

মধ্যে কোড়াইয়ের সঙ্গে করণ্ডির আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। তবে মনসা বা সর্পপূজার সঙ্গে শোলা-চিত্রণের এই নিবিড় সম্পর্ক প্রমাণ করে বাংলায় শোলা-শিল্প খুবই প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। কারণ সর্পপূজার মধ্যে আদিম মানবসমাজের আদিমতম এক বিশ্বাস নিহিত রয়েছে।

শোলার কতকগুলি পাতলা স্তর একটির ওপর আরেকটি আঠা দিয়ে জুড়ে একটি পুরু স্তর তৈরী হয়, কাঁথা বা দেশী তাসের জমির মত। শোলার স্তরগুলি জোড়ার জন্য তেঁতুলের আঠা বা ময়দার লেই ব্যবহৃত বয়। মনসার মেড় ও গোয়ালপাড়ার পিথের মত চিত্রিত ও রঞ্জিত শোলার কাজ পরস্পর পুরু স্তরের ওপরেই হয়ে থাকে।

খেলনা পুতুল তৈরীর জন্য প্রস্থ ও বেদযুক্ত শোলা খণ্ডের প্রয়োজন হয়। শিল্পীর হাতে ধরা যন্ত্রের অল্পকটি অমোঘ আঘাতে সেই সব শোলার টুকরো থেকে পুতুল বা অপরাপর বস্তুর বাঞ্ছিত আকৃতি বেরিয়ে আসে। বাংলার যাবতীয় সনাতন চারু ও কারুশিল্পের মত শোলাশিল্পের ক্ষেত্রেও শিল্পীর দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ঐতিহ্য বংশপরম্পরায় গড়ে উঠেছে।

শিল্পী শোলা দিয়ে অনবদ্য সুন্দর সব বস্তু সৃষ্টি করেন। এগুলির মধ্যে একটি হল 'ঝারা'। শোলার তৈরী ফ্রেমের চারকোণে চারটি কদম্বফুল দোলে। মঙ্গলঘট বা দেবীমূর্তির মাথার ওপর ঝারা ঝোলান থাকে।

মৃন্ময়ী প্রতিমার হাতের চাঁদমালা আরেকটি চমৎকার শোলার সামগ্রী। অর্দ্ধচন্দ্র, তারা, ছোট ও বড় বৃত্ত, প্রস্ফুটিত পূর্ণদল পদ্ম, কল্‌কা, কদম্বফুল, শঙ্খ, হাঁস আর ময়ূরের মোটিফের বিচিত্র সমাহারে রচিত উপর থেকে নীচে লম্বমান চাঁদমালার দুধসাদা অঙ্গে নানা রঙের রাংতাও বসানো হয়।

শোলা দিয়ে তৈরী হয় বিয়ের টোপর আর মুকুট। টোপরের আকৃতি মন্দিরের চূড়ার মত। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের শিখরে যেমন আমলক শিলা থাকে, টোপরের উর্ধভাগেও তেমনি আমলকশিলার অনুরূপ খাঁজকাটা গোলালো অংশ চোখে পড়ে। টোপরের দু প্রান্তে দোলে একটি করে শোলার কদমফুল। সিঁথিমৌর বা মুকুট হল আর একটি অনবদ্য শিল্পকর্ম। বিবাহের মুকুটের আকৃতি দেবপ্রতিমার শিরোভূষণের আদলে আজও রূপায়িত হয়। নক্সা করে কাটা শোলার পাতের ওপর আলাদা করে নক্সা শোলার পাত জুড়ে সিঁথিমৌর। কখনো বা জালিকাটা কাজ করে অর্থাৎ নক্সাটুকু রেখে ফাঁকে ফাঁকে বাড়তি অংশ কেটে বাদ দিয়ে গড়ে ওঠে মুকুটের অনুপম আকৃতি। সাধারণতঃ মুকুটের মাথায় অনেকগুলি পাতার সমষ্টিযুক্ত যে অলঙ্কারটি থাকে, সম্ভবতঃ 'উইশ্‌ট্রি' বা কল্পবৃক্ষ। আবার কোনটির চূড়ায় থাকে কল্‌কা, ময়ুর অথবা ত্রিপত্র। মুকুটের অপরাপর অলঙ্করণের মধ্যে আছে প্রজাপতি, মাছ, জোড়াময়ুর বা হাঁস, শঙ্খ, মণ্ডনায়িত লতা, ফুল, পেঁচাল বৃত্ত এবং ফুলের পাপড়ি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শোলাশিল্পে সনাতন ভারতীয় মোটিফগুলি অবিকৃতভাবে স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শোলার অলঙ্কার প্রস্তুত করতে তার, স্প্রিং, অভ্রের পাত, সোনালী ও রূপালী সল্‌মা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। অনেক সময়ে সুরাট থেকেও বাংলায় সল্‌মা আমদানি হয়।

এই আলোচনাসূত্রে শোলার রাসমঞ্চের উল্লেখ অনিবার্য। এই রাসমঞ্চ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রাস উৎসব উপলক্ষ্যে নির্মিত হয়। শোলার রাসমঞ্চের ওপর ফুল দিয়ে তৈরী জালের অন্তরালে রাধা ওকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ জালের গায়ে শোলার তৈরী নানা পশু ও পাখী আটকানো থাকে।

মায়াময় পার্থিব জগতের প্রতীক বলে এটির নাম ইন্দ্রজাল বা মায়াজাল। যে বেদীর ওপর যুগলমূর্তি স্থাপিত হয়, সেটিও নানারকম শোলার ফুল, পাতা, লতা, কলকা এবং বিভিন্ন পশু ও পাখীর আকৃতি যেমন হাতী, ঘোড়া, কুমীর, বাঁদর, টিয়া, কাকাতুয়া, হাঁস, ময়ূর এবং শোলার কদমফুল ও কদমগাছ দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে। কোন কোন রাসমঞ্চে থাকে শোলার তৈরী ফলন্ত কাঁদিশুদ্ধ কলাগাছ, তাতে একটি শোলার বাঁদর বসিয়ে দিতেও শিল্পী ভোলেন না।

মাটির প্রতিমার আভরণ এবং আবরণ, এক কথায় 'সাজ' তৈরী হয় শোলা দিয়ে। প্রতিমার অলঙ্করণে ডাকের এবং শোলার সাজের প্রসিদ্ধি যেমন সবচেয়ে বেশী, তেমনি খরচও অত্যধিক। পুরো শোলার সাজ হয় দুধসাদা শোলা দিয়ে এবং তা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে সোনালী রূপালী জরি, রাংতা, চুমকি ইত্যাদির ব্যবহারে। ডাক বা রাংতার সাজেও শোলা লাগে। প্রথমে শোলা কাগজের মত পাতলা করে কেটে নিয়ে, তার উপর জামির, চুমকি রাংতা জরির সুতো, অভ্রের পাত বসিয়ে তৈরী হয় ডাকের সাজ। সাজের তলায় সার্টিন বা ভেলভেট কাপড় বা কাগজ লাগানো হয়ে থাকে। এই ভাবে বড় কলকা, ছোট কলকা, ঝালট, হীরাপিট, ক্রাউন, জিনকোষ শাড়ী, আঁচলা, সিঁথি, গলার হার, কানের হাতের এবং পায়ের নানা গয়না তৈরী হয়। তবে যাবতীয় অলংকরণের মধ্যে শোলার মুকুট আর আঁচলা দুটি দেখতে সব থেকে সুন্দর এবং তৈরী করতে পরিশ্রমও হয় যথেষ্ট। প্রতিমার শোলার মুকুটে মকরমুখ এবং মাছ বিশেষ উল্লেখযোগ্য মোটিফ। এই সূত্রে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে খেলনা আর গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে শোলার টিয়া, দাঁড়ে বসা কাকাতুয়া, মাছরাঙা, মাছ ইত্যাদি এক স্বতন্ত্র মূল্যের অধিকারী।

খুব পাতলা করে কাটা কঞ্চির ফ্রেমের ওপর শোলার পাত লাগিয়ে তার ওপর ছবি এঁকে শোলার পট তৈরী হয়। পটগুলি সাধারণত দেড় থেকে দু ফিট লম্বা এবং এক ফুট চওড়া। এগুলির আকৃতি নানা রকমের হয়—কোনটি ত্রিকোণ, কোনটি চালচিত্রের মত অর্ধবৃত্তাকার, আবার কোন পটের মাথার দিক ক্রমশঃ সরু হয়ে শীর্ষদেশটি ফুলের পাঁপড়ির মত ছিলেকাটা। এই পটগুলিতে সচরাচর পৌরাণিক অথবা লৌকিক দেবতার একক আকৃতি আঁকা থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায় শিব, সিংহবাহিনী দুর্গা, জোড়াহাঁসের পিঠে মা মনসা এবং ময়ূরচড়া কার্তিকের প্রতিকৃতিমূলক পট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সব ছবির কোনটিতে পটভূমির রং হল স্বাভাবিক শোলার মত, কোনটির ঘন নীল, কোনটি একসময়ে টুকটুকে লাল ছিল বর্তমানে জলে গিয়ে ফিকে গোলাপী হয়ে গেছে। ছবিতে আকৃতিগুলি কালো রঙের জোরালো রেখার টানে আঁকা। ঐ রেখা বাংলার পট-রেখার মতই অভঙ্গুর ও সুডোল। দেবী-প্রতিমার দেহবর্ণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল হলুদ। ভ্রমরকৃষ্ণ চুল, ভ্রূ এবং অক্ষিতারকা। অঙ্গাবরণ নীল, সবুজ অথবা লাল। বলাবাহুল্য আকৃতিগুলি সবই সামনে ফেরানো।

বৈশ্যসমাজে প্রচলিত নৌকাপূজার জন্য বাণিজ্যের প্রতীক হিসাবে চিত্রিত ও রঞ্জিত শোলার নৌকা তৈরী হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চিত্রিত শোলার জিনিষের মধ্যে রয়েছে করণ্ডি আর মনসার মাধস। উত্তর ও পূর্ববাংলায় মনসাপূজার অপরিহার্য বস্তু করণ্ডির বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। মনসার মাধসও সর্পপূজার অঙ্গীভূত এবং রাজসাহী অঞ্চলে এগুলির প্রচলন আছে।

এতে মনসাদেবীর খোঁদাবোঁচা মূর্তি আঁকা হয়। শোলা দিয়ে গড়া সাপও মাধসের মধ্যে থাকে। এছাড়া শোলা দিয়ে মুখোস তৈরী হয়। রঞ্জিত শোলার মুখোশ রাসের মেলায় কিনতে পাওয়া যায়।

বাংলার বিভিন্ন জেলায় শোলা-শিল্পের কেন্দ্রগুলি বিদ্যমান। হাওড়া জেলার বালি পশ্চিম বাংলার অন্যতম বৃহৎ শোলা-শিল্পকেন্দ্র। এখানে শোলার গায়ে অপূর্ব নক্সা কাজ হয়। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বালি-ব্যারাকপুরে এবং ২৪-পরগণার খড়দহে রাসের উৎসবে ও মেলায় সর্বোৎকৃষ্ট শোলার অলঙ্করণ দেখতে পাওয়া যায়। হাওড়ার আমতা, রামেশ্বরপুর, খুরুট, বসন্তপুর, ডোমজুড় এবং জয়নগরে শোলার কাজ হয়। হুগলি জেলার ডানকুনি, উত্তরপাড়া, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, জনাই, শিয়াখালা, চন্দননগর, কোন্নগর, নবাবপুর ও বেগমপুরের শোলাশিল্প কেন্দ্রগুলি অন্যতম। ২৪ পরগণার আগরপাড়া, আড়িয়াদহ, খড়দহ ও বরানগরে শোলার কাজ হয়। কলকাতার নূতন বাজার, জোড়াসাঁকো, কুমারটুলি, বাগবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের শোলাশিল্প কেন্দ্রগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অপরাপর যে সব অঞ্চল ঐ শিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল মেদিনীপুরের তমলুক, মেদিনীপুর সহর, গড়বেতা, চন্দ্রকোণা ইত্যাদি। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া সহর, মালিয়ারা, জগন্নাথপুর, রাণিয়ারা, সোনামুখী, পাত্রসায়র প্রভৃতি অঞ্চল। বর্ধমান জেলায় বর্ধমান সহর, কাটোয়া, পাটুলি, ডোমহানি, মদনপুর, আসানসোল, বক্তারনগর, বুজুদিহা, পানাগড়, কুরমুন, মণ্ডলপুর, নবগ্রাম, হাট গোবিন্দপুর, নিজাম, ভাতার ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রতিমার সব থেকে সুন্দর শোলার কাজ দেখা যেত কলকাতার জানবাজারে রাণী রাসমণির বাড়ীতে দুর্গা পুজায়। বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর অন্তর্গত পাটুলি থেকে মালাকারেরা এসে ঐ প্রতিবার শোলার সাজ করতেন। বর্ধমানের সেই শিল্প ঐতিহ্য আজও দীপ্যমান। বর্ধমানের বনকাপাসী আর আশেপাশে কয়েকটি গ্রামে ডাকের সাজ, শোলার সাজ এবং অন্যান্য কাজ এক আশ্চর্য উৎকর্ষের সীমানায় পৌচেছে।

নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগর, কালীগঞ্জ, মতিয়ারি, নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে এখনো শোলাশিল্পের চর্চা আছে। নদীয়ার মালকারেরা শোলার টুপি তৈরী করে। মুর্শিদাবাদে বহরমপুর, বেলডাঙ্গা, বেগুনবাড়ি শোলাশিল্পের জন্য বিখ্যাত। বীরভূমে বালিজুড়ি, পাইকর, মাহুলা, নিচিন্তা, দুবরাজপুর, সিউরি, রাজনগর অঞ্চলে শোলাশিল্প কেন্দ্র আছে। উত্তর বাংলায় কুচবিহার জেলা শোলাশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

পূর্ববাংলায় খুলনার চিতলমারিতে শোলার কাজ হত। ওখানকার সুতোয় ঝোলানো শোলার পুতুল গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সংগ্রহশালায় আছে। ঐ অঞ্চলে পুতুলই বেশী তৈরী হত, কারণ এক সময়ে ওখানকার মালাকারগোষ্ঠীর অন্যতম বৃত্তি ছিল পুতুলনাচ দেখানো। বরিশালে শোলার নক্মী কাজ একসময়ে বিখ্যাত ছিল, কিন্তু দেশবিভাগের ফলে সেই শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে।

শোলার নক্মী কাজে বাংলার মালাকারেরা তুলনা রহিত। মালাকার শব্দের অর্থ হল মাল্য রচয়িতা। কিন্তু ফুলবাগান করা, টাটকা ফুলের মালা ও অলঙ্কার তৈরী ছাড়াও মালাকারদের শিল্পী হিসাবে প্রধান পরিচয় প্রকাশিত তাঁদের অনবদ্য শোলার নক্সা এবং অলঙ্করণে। সর্বশ্রী অনন্ত মালাকার, বনকাপাসী গ্রামের আদিত্য মালাকার (যিনি ১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত) ও তাঁর মা, রবীন মালাকার এবং অমৃতলাল ঘোষ প্রমুখেরা শোলাশিল্পী হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। অনন্ত মালাকারের নির্মিত শোলার অনবদ্য দুর্গা প্রতিমা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ

সংগ্রহশালার বিশেষ মূল্যবান সম্পদ।

তিন শ্রেণীর মালাকার নিয়ে মালাকার সমাজ গঠিত—উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী এবং বঙ্গজ। পশ্চিম ও পূর্ববাংলার মালাকার গোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সূত্র স্থাপিত হয় না। রাঢ়ী কুম্ভকারগণের মত রাঢ়ী মালাকারেরা মনে করেন তাঁরা শিব দুর্গার সন্তান। তাই তাঁরা বিশ্বকর্মার পূজা করেন না, কিন্তু শিব-দুর্গার পূজা করেন এবং দুর্গাপূজার দশমী দিবসে ও সরস্বতীপূজায় কাজকর্ম বন্ধ রাখেন। পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলার মালাকার সমাজে কিন্তু বিশ্বকর্মার পূজা হয়, যদিও বাংলার সর্বত্রই মালাকার সমাজে শিবের স্থান সর্বদাই বিশ্বকর্মার থেকে অনেক উঁচুতে।

বাংলায় আচার্যি ব্রাহ্মণরাও শোলার কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট শিল্পীরাও ছিলেন। অনেক সময়ে শোলার কাজে শিল্পোৎকর্ষতা এবং নৈপুণ্যে আচার্যি শিল্পীরা মালাকার গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ২৪ পরগণার মগরাহাটের আচার্যি শিল্পীরা এ ব্যাপারে মালাকারদের প্রতিযোগী।

জানা গেছে যে পশ্চিমবাংলায় কৃষ্ণনগরের কাছে বীরনগরে ডাকের সাজের সূত্রপাত ঘটে। বীরনগরে যে কজন শিল্পী ডাক এবং শোলার সাজ তৈরী শুরু করেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম দুজন হলেন পালিত পাড়ার আচার্যি শিল্পী নীলমণি আচার্য ও কানাইলাল আচার্য। পশ্চিম বঙ্গের আরেকজন অতুলনীয় শোলাশিল্পীর নাম শ্রীনিরোদপ্রসাদ দে।

বাংলার অপরাপর ঐতিহ্যবাহী শিল্পের মত শোলাশিল্পের চর্চাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীর কাছে হতশ্রী মালাকার পল্লী তার প্রমাণ। শিল্পীদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। বর্তমানে তাঁদের মধ্যে বংশগত পেশা ত্যাগ করে অন্য জীবিকা গ্রহণের প্রতি প্রবণতা দেখা দিয়াছে। শ্রীআদিত্য মালাকার শোলাশিল্পের দুটি মুখ্য সমস্যার উল্লেখ করেছেন প্রথমতঃ শোলার কাজে যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়, সে তুলনায় পারিশ্রমিক অত্যন্ত নগণ্য। দ্বিতীয়তঃ সারা বছরে শিল্পীরা সব সময় কাজ পান না, অধিকাংশ সময়ে তাঁদের বেকার হয়ে বসে থাকতে হয়।

তবে চরম নিরাশার মধ্যে এইটুকু আশার কথা যে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন সার্বজনীন পূজায় প্রতিমাকে শোলার সাজে সাজানোর প্রতি আগ্রহ ঘণেষ্ট বেড়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় রামকৃষ্ণপার্কে গত কয়েক বছর যাবৎ শ্যামা পূজায় প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রতিমার যাবতীয় আবরণ ও আভরণ মায় চালচিত্রটি পর্যন্ত নিখুঁত শোলার অলঙ্করণে মণ্ডিত হয়েছে। ডাক ও শোলার নক্সীকাজ গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা হিসাবেও ক্রমশঃ আদৃত হচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকলে বাংলার শোলাশিল্পী বেঁচে যাবে। যেমন আলপনা আজ আর ধর্মীয় মূল্য হারিয়ে আলঙ্কারিক নক্সা হিসাবে বিশেষ মূল্য পাচ্ছে।

সোনামুখীর বাউল মেলা

তৃপ্তি ব্রহ্ম

বাংলার সংস্কৃতিতে মেলার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, মেলাগুলি এক পক্ষকাল বা কিছু বেশী সময় চলার পরেই বাসাবদলের মতো সাজ সরঞ্জাম তুলে নিয়ে নিকটবর্তী আর একটা কোন মেলায় জমায়েৎ হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, মেলাগুলি চক্রাকারে বিভিন্ন স্থান হতে থাকে। যেমন পৌষমাসের সাত তারিখে হয় শান্তিনিকেতনের মেলা, পৌষ-সংক্রান্তিতে জয়দেবের মেলা, শ্রীপঞ্চমীতে দধিয়াবৈরাগী তলার মেলা ও শ্রীনিকেতনের (সুরুল) মেলা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মেলাগুলি যাযাবরের তাঁবুর মতো অস্থায়ী উপনিবেশ। প্রত্যেকটি মেলায় সাধারণতঃ তিনটি রূপ যেমন, (১) অর্থনৈতিক দিক, (২) সামাজিক দিক, (৩) সাংস্কৃতিক দিক।

মেলার এই তিনটি দিকই উল্লেখযোগ্য হলেও আমরা সাধারণত মেলার সাংস্কৃতিক রূপ নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু সমগ্রভাবে মেলার গুরুত্ব বুঝতে হলে এই তিনটি দিকই মূল্যবান এবং একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বিশেষ করে বর্তমান অর্থকরী সমাজে মেলার অর্থ-নৈতিক ভূমিকা কম উপেক্ষণীয় নয়।

শীতের ফসল কাটা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসবের সুরু থেকে মেলা আরম্ভ হয়। এই আনন্দ মুখর মেলাগুলি চলতে থাকে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত। এই সব মেলাতে জড়ো হয় সুদূর পল্লীঅঞ্চল বা দেহাতী অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরণের লোকজন। ফলে এই মেলাকে উপলক্ষ করে গড়ে ওঠে একটি নিবিড় ঐক্য ও সখ্যতা, যার বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। তাই একধারে এই সখ্যতায় যেমন বিয়োগ-ব্যাথা আছে, আবার তেমনই আছে বৎসরান্তে পুনর্মিলনের ইচ্ছা বা আকাঙ্খা অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিবাহের সম্পর্কও এই মেলাতে স্থির করে থাকেন। এছাড়া গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সংবাদ সরবরাহ আদান-প্রদান ও ভাববিনিময়ও মেলাতে হয়ে থাকে। দূর গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ দেখাশুনার ক্ষেত্র এই মেলা। মোটামুটি এইগুলো হল মেলার সামাজিক দিক।

মেলার অর্থনৈতিক দিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গ্রাম্য কারিগর ও শিল্পীদের জীবিকার্জন। দেখা যায় যে, মেলাগুলি শহর এবং কলকারখানা বা যন্ত্রশিল্পে উন্নত অঞ্চল থেকে অনেক দূরে হয়ে থাকে। অনেকস্থলে, ট্রেনপথের যোগাযোগ তো দূরের কথা, মোটরবাস পর্যন্ত চলে না। তখন, যাতায়াত করার একমাত্র উপায় গরু বা মোষের গাড়ী, রিকসা, সাইকেল ভ্যান, ও মালবাহী ট্রাক্ প্রভৃতি। সুতরাং মানুষজন, জিনিষপত্র সবকিছুরই এক সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থা। অনেক ক্ষেত্রে, আবার, যাত্রীরা পায়ে হেঁটে, মাথায় মোট চাপিয়ে বা কাঁধে করে বাঁকবাহী বোঝা নিয়ে মেলায় যায়। এইসব সুদূর পল্লীঅঞ্চলে চাষ-আবাদ-ই প্রধান জীবিকা। আবার কিছু কিছু লোক বিভিন্ন ধরণের ছোটখাট কাজ-কারবার করে দিন গুজরান করে। যেমন—কামার, কুমার, তাঁতি, ছুতার, জেলে-মালো, বেদে ওঝা প্রভৃতি। সারাবছর মেহনত করে এই সমস্ত কারুশিল্পীরা আপন-আপন শিল্পকর্ম

করে রাখে। যেহেতু মেলা একটি প্রকাশ্য বাজারের মতো, প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকে, সেহেতু শিল্পীদের উদ্দেশ্য থাকে নতুন শিল্প নিদর্শন মেলায় হাজির করার। ফলে, যে কোন শিল্পের মান উন্নত করার ব্যাপারে মেলার বিশেষ দান আছে। বেচাকেনার মধ্য দিয়েও বিক্রেতাদের মেলায় একটি মোটামুটি আয় হয়। এইভাবে মেলায় একদিকে যেমন জাতীয় আয়বৃদ্ধির সম্ভবনা দেখা যায়, তেমনই কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে উন্নতিরও সুযোগ থাকে।

মেলার সাংস্কৃতিক দিকের প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয় হল,—(১) লোকশিল্পের নিদর্শন, যেমন মৃৎশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, পাথর শিল্প, বেতশিল্প ও বাঁশশিল্প, এবং ধাতুশিল্প ইত্যাদি। (২) লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য (৩) লোকাচার বা লোকধর্ম ও তৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠান। সাধারণতঃ মেলাতে স্থানীয় লোকশিল্পের নিদর্শন দেখার একটি বড় সুযোগ থাকে। সামগ্রিকভাবে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতে হলে প্রতিটি জেলার প্রতিনিধিস্থানীয় ক্ষুদ্র-বৃহৎ মেলাগুলি পরিদর্শন করা একান্ত প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের এরকম শতশত মেলার মধ্যে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর মেলা অন্যতম এবং তার একটা বিশেষ রূপও আছে।

এই মেলা সাধারণভাবে সোনামুখীর বাউলমেলা নামে বিখ্যাত। মেলা অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র মাসের বাসন্তী পূজার দুর্গানবমীতে। এটি একটি বাৎসরিক মহামেলা। সোনামুখী একটি মিউনিসিপ্যাল টাউন এবং বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। বাঁকুড়ার অভয়াশ্রমের প্রাচীনতম কেন্দ্র সোনামুখী। অধুনা গান্ধী আশ্রমের মুখ্যকুটির এখানে স্থাপিত হতে চলেছে। সোনামুখী নামকরণ হয়েছে স্থানীয় প্রাচীন লোক দেবতা স্বর্ণময়ী দেবীর নাম অনুসারে। সোনামুখীর দর্শনীয় কীর্তির মধ্যে বিখ্যাত হল, ইটনগরের কালীমন্দির, দেবী স্বর্ণময়ীর মন্দির, বড় কাতিকতলা, শ্যামসুন্দরের মন্দির ও মনোহর তলা। এই মেলা হয় রামচন্দ্রের জন্মদিন রামনবমীতে। তবে বর্তমানে এই মেলা হয় বিখ্যাত মনোহর ক্ষেপার নামে।

মনোহর ক্ষ্যাপা ছিলেন একজন বৈষ্ণব সাধু এবং তিনি ছিলেন স্থানীয় শ্যামসুন্দরের মন্দিরের উপাসক। ক্ষেপা মনোহর জাতিতে বৈষ্ণব ও একজন কনৌজ ব্রাহ্মণ। মনোহর সম্বন্ধে একাধিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তার মধ্যে শ্যামসুন্দর মন্দিরের বর্তমান অধিকারী ও পুরোহিত শ্রীবংশীবদন চ্যাটার্জী মহাশয়ের কাছ থেকে যে বিবরণ পাওয়া গেছে তা এই :

মনোহর প্রাচীন জন্মভূমির পাশ দিয়ে অহম্যাবাইরোড ধরে সোজা নীলাচলে যাত্রা করেন। খুব সম্ভবতঃ যাবার সময় এই শ্যামসুন্দরের মন্দিরের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং প্রভুর সেবার্থে এখানেই থেকে যান। পরে তিনি তৎকালের মন্দিরের অধিকারীর কন্যা রাইধনিকে মাতৃসম্বোধন করেন ও ঐ কন্যার বিবাহ দেন বর্দ্ধমান জেলার বুধবুধ এর কাছে ক্ষেত্রপাল নামক স্থানের স্থানীয় চ্যাটুজ্যে বংশীয় ছেলের সঙ্গে। উত্তরকালে এই বৈবাহিক সূত্রধরেই জামাইকে ঘরে রাখেন এবং প্রায় ১৮০০ এর মতো তাঁতী সম্প্রদায়কে এসে সোনামুখীতেই ঘরবসত করান ও তাঁতশিল্প দ্বারা জীবিকা করার ব্যবস্থা করে দেন। এ ছাড়াও তিনি নানাভাবে তাঁতীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করতেন ও তাদের বিপদ আপদে পাশে দাঁড়াতেন এবং প্রয়োজনবোধে তাদের অসুখে বিশেষ দৈব ও গাছ-গাছড়ার ওষুধ দিতেন।

তাই মনোহরের পুণ্যস্মৃতিতে আজও তাঁতীরা ক্ষ্যাপাবাবার নামে মেলা-উৎসব করে থাকেন। জনশ্রুতি আরও আছে যে মনোহর সমাধিত হবার আগে একটি বড় রকমের মাটির পাত্র তৈরী করিয়ে নিদর্শন দেন যে তাঁর সমাধি পর ঐ মৃৎপাত্র দিয়ে যেন তাঁকে আবৃত করা হয়। হয়েছিলও তাই, এবং রামনবমীতেই। সেই থেকে রামনবমীতেই মেলা হয়। এই মেলায় অন্যান্য সাধু অপেক্ষা বাউল বেশী আসে বলে মেলাটি 'বাউল মেলা' বলে বিখ্যাত। এই মেলার খরচ এবং সাধুসেবা হয় তাঁতীদের সারা বৎসরের একটি সঞ্চিত তহবিল থেকে। মেলা তিন দিনব্যাপী হলেও মেলাটি বিরাট এই মেলার খরচ চলে—

(১) তাঁতের কাজ করে শাড়ী চাদর ইত্যাদি বোনার পর যে অবশিষ্ট কাপড়ের টুকরো থাকে সেটা সারা বছর ধরে জমা করা হয়। বছরের শেষে এবং মেলার আগে এই জমানো কাপড় বিক্রি করে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তা মেলাতে ব্যয় হয়।

(২) তাছাড়া পৃথক একটি তহবিল ও ক্ষ্যাপাবাবার নামে থাকে সেখানে প্রতিদিনের উপার্জিত অর্থের কিছু কিছু জমিয়ে রাখা হয়।

(৩) জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সোনামুখীর প্রত্যেক পরিবারের কর্তব্য হল বিবাহের সময় মনোহর বাবার নামে কিছু দান করা। এই দানের অর্থও মেলায় ব্যয় করা হয়।

এইভাবে প্রতি বছর মেলা হয়ে থাকে। মেলায় নানা প্রকার জিনিষপত্রের বেচাকেনা চলে। যেমন গাছদ্রব্য, বেলুন-বাঁশী, চুড়ি-শাঁখা, মালা-ঘুনসি প্রভৃতি। এ ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য সোনামুখীর তাঁতশিল্পসম্ভার, বাঁকুড়ার নিজস্ব পোড়ামাটির মৃৎশিল্প (হাতি, ঘোড়া, মনসার ঝারি ইত্যাদি)। কাঠের তৈরী নানাপ্রকার ছোট বড় মাপের কুনকে পাওয়া যায়। বর্তমানে বাজারে মন্দার ফলে শিল্পকর্মে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সুতরাং এই মেলার বেচাকেনা অনেক নিম্নমানের। তুলনামূলক ভাবে গ্রাম বাংলার অন্যান্য মেলা অপেক্ষা এই মেলায় বেচাকেনা অনেক কম। তার প্রথম ও প্রধান কারণ দারিদ্র্য ও আর্থিক অবনতি।

এই মেলায় বাংলায় বিভিন্ন স্থানের বাউলরা বৎসরান্তে মিলিত হয় ও আনন্দলাভ করে থাকে। সহজ সরল গ্রামবাসীদের প্রাণের বন্ধু বাউল এবং বাউলের গানে গুহতত্ব যাই থাক না কেন সাধারণ গ্রামের মানুষ মনে করে বাউল তাদের মনের কথাটিই গান গেয়ে ওঠে একতারার সুরে সুর মিলিয়ে—

'তুই এলি যখন জাল নিয়ে
কেন দেখলি না চেয়ে—
কোন জলে মীন থাকে কখন
তারে ধরতে লাগে সাধন ভজন (বলি অসাধারণ)
তুই কিনারাতে দিলি খিয়ে।'

—এখানে এ কথা তো সরল জেলের মনের কথা—এতে তত্ত্বের অবকাশ কোথায়? বরং জেলের 'কোন জলে মীন থাকে কখন' সে জ্ঞান নেই বলেই না জালে মাছ ও পড়েনি এবং দিন গুজরাণের ভরসাই বা কি? এখন তার অবস্থা—

"তোর জীর্ণ অনুরাগের সুতো
ছিঁড়ে যায় জাল টানতে গেলে।'

—কবে এলোপাকের সুতো দিয়ে জেলে বুনেছিল এই জাল; দেওয়া হয় নি তাতে গাব-কালি নিষ্ঠা সহকারে। মাগো! জালও আজ জীর্ণ, মাছও পড়ে না। সুতরাং অনভিজ্ঞতাই তার কাল হল—কারণ; 'জল দেখে মাছ জানতে পারে জেলে যারা হয়।'

—অতএব, এখন তার অবস্থা এইরূপ—

তুই বা কোথায়
চাঁদ বা কোথায়
হাত বাড়ালি কি বলে।
ওরে মন-জেলে॥'

সমঝদার শ্রোতা সন্দেহ নেই। কথাও তাদের মনের কথা। তাই খুশী হয়ে বকশিশ করে বাউলকে নিজেদের সামান্য অর্থ থেকেও।

গত প্রায় দশ বছর ধরে মেলায় ঘুরে ঘুরে যা দেখেছি তা হল মেলায় অকৃত্রিম রূপের ক্রমিক বিকৃতি। আজকাল বেশ কিছুসংখ্যক নিছক শৌখীনবাবু মেলায় যান, পরিদর্শক হিসাবে এবং কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য। মানে, তা ফ্যাসানে দাঁড়িয়ে গেছে এবং এই সমস্ত শৌখিন মানুষজনের মনের মত হবার জন্য মেলার রুচিরও পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। যেমন, বাউল গানে মাইকের ব্যবহার। ফলে, বাউলের একতারাতে মেঠো সুরের গান ব্যাহত হচ্ছে এবং যন্ত্রসঙ্গীত প্রাধান্য পাচ্ছে। তাছাড়া, মেলায় সিনেমা, হুজুগী ব্যাপার, নাগরদোলা, প্লাষ্টিক, রবার ইত্যাদির পুতুল ও অন্যান্য জিনিষ, রেডিমেড জামাকাপড় প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে। মানে গ্রাম্য মেলাগুলি আপন স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছে। এমন কি দেখা যায় মেলায় দেহাতী মেয়েরা আসছে রেডিমেড্ জামা-কাপড় কেনার জন্য। ফলে, তাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময়তা আজ খুঁজে পাওয়া যাবে খুব কম। বাউল গানে বৈষয়িক ব্যাপার পূর্ণমাত্রায় প্রবেশ করেছে; নাম প্রচার, অর্থ উপার্জন ও ইনামলাভের আশায়। ফলে বাউল গানের সুরের সঙ্গে, লোকসঙ্গীত, পল্লীগীতি ও ভাটিয়ালী সুর প্রবেশ করেছে। তাতে বাউল গানের ইশারায় বা জীবনজিজ্ঞাসায়; কি সাধনরহস্যে প্রতীক ব্যবহার করা অপেক্ষা, অশ্লীল কথার ব্যবহার ও মাইকবাজি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ভীতির কথা এই যে; এই ভাবে, চলতে গিয়ে বাউল অসীমকে সীমার মধ্যে বেঁধে ফেলছে ক্রমশই। আজ তাই লক্ষ্য করি, যে বাউল গান শোনা অপেক্ষা পল্লীবাসী মানুষেরা বাউলদের কাছ থেকে গোপন রোগের গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। বাউলকে খাতির করে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যায়, প্রণামীও দেয় এই জন্য বাউলের ভাষায় বলি—মানুষ কর্মকাণ্ডাই থেকে গেল চিরকাল—

আছে চোখের কাছেই চিন্তামণি
তাঁকে চিনতে জানলে হয়;
যারা কর্মকাণ্ড ঠাহর পায় না—
ঘুরে বেড়ায় জগৎময়॥

ভারতের দুর্গ ঃ প্রস্তরযুগীয় পটভূমিকা

সন্তোষকুমার বসু

দুর্গ ও দুর্গ-স্থাপত্যের আলোচনার সূচনা হতে পারে মানুষের প্রস্তরযুগের জীবনের সময় থেকেই। ভারতীয় উপ-মহাদেশের বহু বিস্তৃত প্রাঙ্গণে দুর্গ বা দুর্গ-সদৃশ বাসস্থলের মূল্যায়ণ পূর্ণাঙ্গভাবে করে ওঠা সহজসাধ্য নয়। কারণ দেশের বিভিন্ন অংশে একই সময়ে সমপর্যায়ের কৃষ্টি ও কারু-কৌশল মানুষের আয়ত্ত হয়নি।

আদিম মানুষ তার বাসস্থান নির্বাচন করে নিয়েছে প্রকৃতির ভূমি-গঠনের ও ভূপ্রকৃতির দিকে সতর্ক লক্ষ্য রেখে। কাজেই প্রাথমিক বাসস্থলের একাধিক সুবিধা অসুবিধা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে পরবর্তীযুগে পূর্ণাঙ্গ আকারের দুর্গ-নির্মাণেরক্ষেত্রে কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে কাজে লেগেছে।

ভারতীয় উপ-মহাদেশের প্রস্তরীয় প্রাগৈতিহাসচর্চার একটি বিশেষ দুর্বলতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রচলিত ধারায় আমাদের প্রত্নবেত্তাগণ ও প্রত্ন অনুসন্ধানের প্রতিবেদন রচনাকারীরা মানুষের তৈরী পাথরের হাতিয়ার তৈরীর পদ্ধতি ও প্রস্তর আয়ুধের শ্রেণীবিভাগ করার কাজ নিয়েই নিজেদের অধিকতর ব্যস্ত রেখেছেন। অন্যদিকে প্রত্নক্ষেত্রের প্রকৃতি ও সম্ভাবনাময় প্রস্তরীয় মানবের বাসস্থলের নিখুঁত বিবরণ রচনার কাজটি বহুলাংশে অবহেলিত রয়ে গেছে।

প্রস্তরীয় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কাল ও কৃষ্টিবিচার প্রধানতঃ ব্যবহারযোগ্য পূর্ব-পরিকল্পিত হাতিয়ারের উপাদান ও উৎপাদনের দ্বারা নির্দিষ্ট। এই সময়ের মানবগোষ্ঠী আহার্য অনুসন্ধানে রত যাযাবরী বৃত্তিতে অভ্যস্ত ছিল। ক্রমে ক্রমে আদি প্রস্তরযুগের মধ্যকালে ও অন্তিম পর্যায়ে মানুষ ধীরে ধীরে বাসস্থান নির্বাচন করে নিতে শিখেছিল বলে অনুমান করা হয়। এই সময়ে তাদের বাসস্থান হত পাহাড়ী খাড়াইয়ের ধারের নাতিদীর্ঘ ও নাতিপ্রশস্ত চত্বরে। সাধারণতঃ এই চত্বরের পশ্চাতে থাকত উপরে উঠে যাওয়া পাহাড়ের প্রাচীর। সময়ে সময়ে চত্বরের উপরে পাহাড়গাত্র থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা পাথরের আচ্ছাদন থাকত। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় প্রকার বাসস্থল তখনকার মানুষের পক্ষে আরও উন্নত পর্যায়ের বলে বিবেচিত হত। এর পরে আমরা আসতে পারি স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট পাহাড়ী গুহার কথায়। সাধারণভাবে দেখা গেছে আদিম মানুষ পাহাড়স্থিত গুহার সামনের দিকটায় অথবা মুখের দিকটায় বাস করত। কোন কোন সময়ে গুহার সামনের সঙ্কীর্ণ চত্বরকে খানিকটা প্রশস্ত করে নেওয়ার চলনও ছিল। হাতিয়ার তৈরী করবার উপযুক্ত নুড়ি বা পাথর পেলে প্রস্তরীয় মানুষ স্থান-নির্বাচন করে অস্থায়ী বাসগৃহ ঠিক করে নিত।

আমাদের পক্ষে মানুষের ইতিহাসকে কোনকারণেই একটা কাটা ছেঁড়া অধ্যায়ে বিভক্ত, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ বিহীন বিক্ষিপ্তকৃষ্টি পর্যায়ের মাধ্যমে ভাগ করা উচিত হবে না। মানুষের বহু ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় সৃষ্ট গৃহ নির্বাচন ও গৃহ নির্মাণের রীতি পর্যায়ক্রমে চলে এসেছে পরস্পরকে প্রভাবিত করার মধ্য দিয়ে। কাজেই যদি আমরা মনে রাখি যে দুর্গের সৃষ্টি হয়েছিল গোষ্ঠী আবাস বা জনপদকে সুরক্ষিত করার জন্য তাহলে প্রস্তর যুগের বাসস্থানের বিশিষ্ট প্রকৃতির মধ্যে আমরা

দুর্গভূমি ও দুর্গস্থাপত্যের একাধিক প্রাথমিক পদ্ধতির উন্মেষ দেখতে সমর্থ হবে। দুর্গের অবস্থান নির্বাচন করার অনেকগুলি মূল উপদেশে সুউচ্চ স্থানকে দুর্গ নির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত রূপে পরবর্তীকালে বহুগ্রন্থাদিতে বলা হয়েছে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রস্তরযুগের আবাসস্থলও নির্বাচন করা হয়েছে প্রধানতঃ চারিদিকের জমি থেকে উপরে ওঠা উচ্চস্থলে। এতে বাসস্থলের উচ্চাসন থেকে বহুদূরব্যাপী নিম্নাঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি রাখলে সুবিধা হয় একথা মানুষের কাছে সেই সুদূর অতীতেও অজানা ছিল না। আবার নিম্নাঞ্চল থেকে উপরে ওঠার কাজটি সহজসাধ্য ছিল না মানুষ বা পশু কারোপক্ষেই। এতে আদিম অধিবাসীদের আত্মরক্ষার সময় ও সুযোগ থাক। পশ্চাতে পাহাড়ী গুহা আর তার উপরে উঠে যাওয়া প্রাচীর আদি মানুষকে সুরক্ষার দিক থেকে বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত করে দিত।

ভারতীয় উপ-মহাদেশের একেবারে উত্তর-পশ্চিম সীমানায় বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত পেশোয়ার ছাড়িয়ে পাঠান উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের একটি প্রস্তরযুগীয় গুহাবাস এক্ষেত্রে আমাদের নিকট আকর্ষণীয় উদাহরণ রূপে পরিগণিত হতে পারে। 'সাজ্যাও' নামে একটি প্রাচীন বৌদ্ধকীর্তির ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ গ্রাম আছে এখানে। এই স্থানের কাছেই 'পার্থো দর্‌রা' নামে একটি গুহাবাস আছে। 'পার্থো দরবরা'র গুহাটি মস্ত বড়। এখানে উৎখনন করে পোড়া কাঠ কয়লা বিভিন্ন প্রাণীর হাড়-গোড় দিয়ে পরিত্যক্ত মাটির ঢিবি দেখে বোঝা যায় এখানে প্রাচীন মানুষ বহুদিন ধরে বসবাস করেছিল। এখানে মানুষের ব্যবহার করা পাথরের হাতিয়ারের ও অভাব নেই। এখন স্থিরভাবে বিচার করলে কয়েকটা জিনিস বেশ স্পষ্ট করে বোঝা যায়। বন্যপ্রাণীর অনুসন্ধানরত প্রস্তর যুগের মানুষ এখানে আগমন করার পর দেখেছিল যে এটি একটি বেশ সঙ্কীর্ণ উপত্যকা। উপত্যকার দুই পাশে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল অতি উচ্চে উঠে গেছে। স্বল্প পরিসর উপত্যকার প্রতি দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজনে এই গুহাবাসটি অতুলনীয়। সংকীর্ণ গিরিপথ আরও একটা বাড়তি সুবিধা করে দিয়েছিল। এখানকার শীত ও গ্রীষ্ম দুইই তীব্র। তার হাত থেকে বাঁচবার এমন একটা স্থান নির্বাচন করাটা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের প্রস্তরযুগীয় বাসস্থানের অনুরূপ স্থান-নির্বাচনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। দক্ষিণের মালভূমি এলাকায় কোওপুর সন্নিহিত স্থানে, মধ্যভারতের নর্মদা তীরস্থ ও নর্মদার অববাহিকার প্রস্তর যুগীয় প্রস্তুকেন্দ্রের অবস্থান নদী-চত্বরের কাছাকাছি। পশ্চিম পঞ্জাব, পূর্বপঞ্জাবের পাহাড়ী অঞ্চলে, উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে—সহজ কথায় ভারতীয় উপমহাদেশের নানান দিকে—এই রীতিই দেখা যায়। এর কারণ পানীয়ের জন্য নদীর নিকটে থাকার প্রয়োজন হয়েছিল আদিমকালের মানুষের কাছে। অন্যদিকে নদীপ্রবাহ অন্ততঃ একটি দিক থেকে সহসা আক্রমণের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করার সুযোগ সৃষ্টি করত। নদী বা জলাধারের নিকট দুর্গ বসতি অথবা দুর্গ স্থাপন করার রীতিও অনেককাল পরের প্রতিরক্ষা স্থাপত্যের একটি সাধারণভাবে স্বীকৃত নীতি। এটি এতই সুপরিচিত যে পরবর্তীকালে বহু দুর্গকে হয় হ্রদ বা অন্যবরণের জলাশয়ের নিকট স্থাপন করা হয়েছে অথবা কৃত্রিম পরিখার সাহায্যে দুর্গের চারিদিকে নিকটস্থ নদীর জল ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আবার সহজে জল আনয়নের সুবিধার ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছে। প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষার্ধের কাল থেকে

নদীধারের বাসস্থল অনেকটা খোলামেলা জায়গায় থাকতো। কিন্তু এক্ষেত্রেও মানুষ প্রধানতঃ পাহাড়ে, পাহাড়ী জমিতে বা চূড়োর দিকটাতে থাকতে পছন্দ করে নিত বলে অনুমিত হয়। মধ্য-ভারতে বা উত্তর কর্ণাটকে এবং পূর্বভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জিলার বীরভানপুরে মাটিতে খুঁটির দাগ থাকা প্রস্তুকেন্দ্রের সন্ধান লাভ করা গেছে।

প্রস্তর যুগের কথায় আমাদের নিশ্চয়ই বাঁকুড়া জিলার শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহা-কন্দরের কথা ভুলে থাকলে চলবে না। পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক অনুসন্ধানের ফলে হয়ত এখানকার পাহাড়ী মাটি থেকে আদিম প্রস্তাবাসের প্রমাণ সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে। শুশুনিয়ার একাধিক পাথরের হাতিয়ার আমাদের এই অঞ্চলটি যে প্রস্তরীয় মানুষের বসবাস কেন্দ্র ছিল সেকথা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

এবারে আমরা আসব নবপ্রস্তরীয় বাসভূমির বিবরণে। কিন্তু তার আগেই বলে রাখা ভাল যে গঙ্গার দক্ষিণে মির্জাপুর ও বান্দা জিলায় মধ্যভারতের হোসঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রস্তরাচ্ছাদন বিশিষ্ট গুহাসদৃশ বাসস্থলের অধিকতর সতর্ক মূল্যায়ন প্রয়োজন। দরকারমত ঐ অঞ্চলের আদিমবাসীরা ঐ সমস্ত স্থানকে কি ভাবে ব্যবহার করেন তার সমীক্ষা বাদ দিলে চলবে না।

নব্যপ্রস্তরীয় যুগ বহুদিক থেকে তার পূর্ববর্তীকালের যাযাবরী বৃত্তি থেকে সরে আসা অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের কালরূপে চিহ্নিত। এখানে আমরা কাশ্মীরের দুই একটি বিশিষ্ট প্রস্তুকেন্দ্রের সংবাদ নিতে পারি। এখানকার বুর্জাহোম, গুফ্‌ক্রাল প্রভৃতি স্থানে 'প্লিস্টোসিন' যুগের শুকিয়ে যাওয়া হ্রদের কাদামাটির স্তরে প্রাচীন মানুষের বাসস্থান পাওয়া গেছে। এই বাসস্থান প্রকৃতি ও শত্রুভাবাপন্ন গোষ্ঠী বা বন্যপ্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাটির ভিতরে গর্ত খুঁড়ে নির্মাণ করা হয়েছে। সুরক্ষার প্রয়োজনে নির্মিত এই বাসস্থানের নীচের দিকটা অপেক্ষাকৃত চওড়া আর উপরের মুখের দিকটায় সরু। গুহার বা গর্তের উপরে দিকটা শাখা-প্রশাখার আচ্ছাদনে ঢাকা। গর্তের মধ্যে নামা-ওঠা করার জন্য স্থায়ী সিঁড়ির ব্যবস্থা করা হয়নি। মনে হয় সরিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত সিঁড়ি ব্যবহার করতো। পরবর্তী যুগের দুর্গে দুর্গের রক্ষাদির ব্যবহার সর্বজনবিদিত। দুর্গস্থাপত্যে মাটির অভ্যন্তরের আওরগৃহ, কারাগার ও ঘাতায়াতের জন্য গোপন পথ বা সুড়ঙ্গের ব্যবহার ব্যাপক।

দক্ষিণভারতের নব্যপ্রস্তরীয় বসতির অন্যতম কয়েকটি মালভূমি অঞ্চলের কালমাটির সমতল-ভূমিতে থাকা ক্ষয়ীভূত পাথরের পাহাড়ের অবশিষ্টাংশের উপর অবস্থিত। যে সমস্ত স্থানে অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক গুহা-কন্দর ও প্রস্তরাচ্ছাদন আছে সেখানে মাঝে মাঝে পাহাড়ের পার্শ্বস্থিত চত্বরকে প্রসারিত করে নেওয়ারও একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়।

এরপর কর্ণাটক ও অন্ধ্রে আর এক প্রকৃতির বাসস্থানের কথায় এবারে আমাদের এসে পড়তে হবে। এইপ্রকারের বাসস্থলে কাঠের বড় বড় খুঁটি দিয়ে গৃহপালিত গবাদি পশু রাখার খোঁয়াড় তৈরী করার প্রথা প্রচলিত ছিল। খুঁটি দিয়ে তৈরী প্রাচীরের ভিতরের দিকটায় থাকতো পশুর দল। এর বাইরের দিকে থাকতো আর একটা খুঁটির প্রাচীরের বেড়। পশুপালকদের বাসস্থান ছিল বাইরের দিকের ঘেরা জায়গার মধ্যে। দুর্গ স্থাপত্যের যে কোন সাধারণ অনুসন্ধানীর পক্ষে এই প্রকারের বাসস্থলের সঙ্গে পরবর্তীকালের দুর্গ পরিকল্পনার একটা অর্থবৎ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। একটু চিন্তা করে দেখলে মূল ধনসম্পদকে (এ ক্ষেত্রে পশুদল) ভিতরের দিকে প্রতিরক্ষা প্রাকার দিয়ে ঘিরে

রাখার প্রথা পরবর্তীকালে প্রায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল; মূল দুর্গকে ঘিরে রাখা হত একটা প্রাচীরের আড়ালে। এর বাইরে থাকত সাধারণ দুর্গ প্রাকার। আবার সমগ্র দুর্গকে একটা মস্তবড় অঞ্চল নিয়ে ঘেরা নগরপ্রাকারের সাহায্যে সুরক্ষিত করা চলন ছিল ভারত সমেত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা বোঝা যাবে যদি আমরা মনে রাখি যে পৃথিবীর একাধিক দেশে দুর্গ সন্নিবেশ সম্পর্কিত পরিভাষায় বাইরের দুর্গ ও দুর্গপ্রাকার এবং ভিতরের দুর্গ ও দুর্গপ্রাঙ্গন প্রভৃতির পৃথক পৃথক নাম আছে। দক্ষিণদেশের এইসব প্রত্নক্ষেত্রের মধ্যে কুণগল উৎখনন প্রভৃতি কেন্দ্রাদি এবং সমপ্রকৃতির কেন্দ্রাদি উল্লেখ করার যোগ্য।

মানব কৃষ্টির ও জীবনধারণের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত প্রকারের স্থাপত্য প্রয়াসের একটা একেবারে প্রাথমিক রূপ আছে। প্রস্তর যুগীয় পটভূমিতে সুরক্ষা ও আত্মরক্ষার যে প্রেরণা ছিল বাসস্থল নির্বাচন করার ব্যাপারে সেটাই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন নগর প্রাকারের রূপ পরিগ্রহণ করেছে অন্যদিকে তেমনি দুর্গ পরিকল্পনার সুষ্ঠু প্রকাশকে সম্ভবপর করে তুলেছে।

আলোচনার সুবিধার্থে আমাদের বহু সহস্র বৎসর পূর্বের আদি ও মধ্য প্রস্তর যুগের সঙ্গে সঙ্গে এখানে সেইজন্য অনেক পরের দিকের প্রস্তরীয় সভ্যতার কথা এখানে বলবার প্রয়োজন ছিল। যদিও ভারতের নাগরিক সভ্যতার ও সুরক্ষিত গ্রামবসতির ধারা হরপ্পীয় যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের একটি সুবৃহৎ এলাকায় বহুমুখী অগ্রসরমানের প্রমাণ চিহ্ন রেখে গেছে আকর্ষণীয় প্রত্ন নিদর্শন ও সৌধাবলীর মাধ্যমে।

প্রস্তরীয় প্রাগৈতিহাসের সময়ে দুর্গ সম্বন্ধীয় আলোচনায় কালানুক্রমের একটা গুরুত্ব অবশ্যই আছে। ভারতের তথা ভারতীয় উপমহাদেশের সুপরিচিত আয়ুধ প্রাপ্তির কেন্দ্রগুলি দশ-বারো হাজার বৎসর থেকে সুরু করে সুদূর অতীতের দিকে বহু সহস্র, এমনকি লক্ষাধিক বৎসর অতিক্রম করে চলে গেছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের সোহন উপত্যকার প্রত্নায়ুধ, দক্ষিণে অত্তিরামপক্কম ও পূর্বভারতের শুণ্ডনিয়া প্রভৃতি নানা স্থানের আয়ুধ বেশ পুরাতন। আবার মহারাষ্ট্র অঞ্চলের কোন কোন কেন্দ্র প্রাচীন প্রস্তর যুগের মধ্যস্তরেই বিশ থেকে চল্লিশ হাজার বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রের এর প্রাচীনত্ব ছয় থেকে দশ সহস্র বৎসর। কাশ্মীরের নব্য প্রস্তরীয় বসতি এখন থেকে প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বেকার বলে অনুমিত। দক্ষিণভারতের নব্যপ্রস্তরীয় কেন্দ্র কুণগল, উৎখনন প্রভৃতির বয়স প্রায় ঐ সময়েরই নিকটস্থ অথবা তার কয়েক শতাব্দী পরের।

বর্তমান আলোচনায় আমরা হরপ্পা সমেত সমগ্র হরপ্পীয় প্রত্ত্বাঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করিনি। কারণ বিকশিত হরপ্পীয় কৃষ্টি একটি অতি উন্নত শ্রেণী-বিভাজিত নাগরিক সমাজব্যবস্থার পরিচয় বহন করে। এই সমাজে সুরক্ষিত নগর শাসনকেন্দ্র ও দুর্গের গোড়াপত্তন হয়েছিল সুনির্দিষ্ট পথে। কাজেই সেটির সম্পর্কে আমাদের সমস্ত অভিমত ও বক্তব্য পৃথকভাবে আলোচিত হবার যোগ্য।

এখানে আমরা কেবলমাত্র একেবারে ভিত্তিমূলক স্তরের মানবিক জীবনযাত্রায় বসতি নির্বাচনের প্রকৃতি নিরূপণের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালের দুর্গম ও সুরক্ষিত দুর্গ-সন্নিবেশের কোন বিবর্তনের সাহায্যে গড়ে ওঠা স্বাভাবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য সম্পর্ক আছে কিনা তারই একটা অনুসন্ধান করার প্রচেষ্টা মাত্র।

রসরাজ শেখ গুমানী

নিত্যরঞ্জন বসু

ঠিক পনের বছর আগে বীরভূমে নলহাটি এইচ. পি স্কুলে চারণকবি সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন সুরু হয়েছে। কর্মব্যস্ত সম্পাদক শেখ গুমানী দেওয়ান রাত্রির দিকে একটু অবসর করে নিয়ে মস্ত এক ফিরিস্তি এনে হাজির করলেন। পরের দিন অধিবেশনে প্রস্তাবাকারে ঐ বক্তব্য তিনি রাখতে চান। ওঁর ঐ কাগজগুলির বক্তব্য সংক্ষেপ করলে মনে হবে বাঙলার কবিয়ালরা সেই মুহূর্তে সরকারের কাছে দাসখৎ লিখে দিতে চাইছেন। যে অধিবেশনে যোগ দিতে সমস্ত জেলা থেকে ছোটবড় ৪০।৪২ জন কবি সদলবলে এসেছেন সেখানে কারোর সঙ্গে পরামর্শ না করে প্রস্তাব আনা হচ্ছে; (১) পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেক মহকুমায় কবি শিক্ষাগার স্থাপন করে (পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে) চারণ কবিদের অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করুন। (২) যে চারণ কবিরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কবি শিক্ষাগার স্থাপন করবেন সরকার যেন তাঁদের যাবতীয় অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। (৩) চারণকবিরা যাতে সুষ্ঠুভাবে অঞ্চল বিশেষে কবিগানের আসর বসাতে পারেন তার জন্য স্থানীয় জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক মারফৎ সরকার সাহায্য করেন। বলা বাহুল্য এই তিনটি ব্যাপারে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত গুমানী সাহেবের সঙ্গে লড়াই চলেছিল। শেষ পর্যন্ত উনি শিশুর মতো হেসে বলে ফেললেন, 'ওরে বাবা, এসব আমাদের জন্যে চাইছি না। চাইছি যাদের জন্য তাদের দিকে কেউ ফিরেও চায় না। আমরা তো যাহোক চালিয়ে যাচ্ছি। কলকাতাই বাপধন দয়া করে হুজ্জতি না করে কাল প্রস্তাবটি পাশ করতে দাও পরে এ নিয়ে লড়াই কোরো' বুদ্ধের অনুরোধে পরের দিনের অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপনের সময়ে অনুপস্থিত থাকা যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। অধিবেশন শেষে ফিরে আসার পর শোনা গেল সভাপতি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে খুব অনুকূল মন্তব্য করেন নি। গুমানীসাহেব তবু অটল, 'চাষবাস' পরিবার পরিকল্পনা, সরকারী ঘোষণা, যুদ্ধের খবর— সব কাজেই আমরা ফাটিয়ে দেব। আর এঁদের হল শুধু উল্টাপাল্টা বলা।'

ঐ অধিবেশন শেষ হবার মাসখানেক বাদে মুর্শিদাবাদ কান্দীর জিনদিঘী, তাঁতবিরল থেকে একটি দীর্ঘ পত্র এসে হাজির। 'শ্রীমান্…তোমার সেদিনকার আলোচনায় যৎপরোনাস্তি খুশী ও উপকৃত হইয়াছি। তুমিও নিজেও সম্ভবত বুঝিবা সমিতি করিতে গেলে বহু লোকের মন রাখিতে হয়। সকলে যদি গোলাম হোসেন হওয়ায় গৌরব ও নিরাপদ বোধ করে তাহাতে আমার কি করার আছে? ঐ রাত্রির পর হইতে চিন্তা করিতেছি বুঝিতেছি সরকারের হুকুমের গানে রহিয়াছে কবিয়ালের মৃত্যুবান লুকানো। আশা করি আমাকে ভুল বুঝিবে না। আমি ও লখোদর চক্রবর্তী ২।১ দিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গে গান করিতে যাইব। কর্মক্ষেত্রে ক্ষতি না হয় এমনভাবে আসা সম্ভব হইলে অবশ্যই আসিবে।'…পরের সপ্তাহে বাংলার দুই ধুরন্ধর কবিয়াল লখোদর ও গুমানীর গানের আসর বসল ফরাক্কার কাছে। গানের বিষয়, সভাকবি বনাম স্বভাবকবি। লখোদরবাবুর ভূমিকা ছিল সভাকবির এবং গুমানীসাহেব স্বভাবকবি। ঐ আসরে খানিক পাঁয়তারা কষে গুমানীসাহেব নলহাটির

আলোচনায় যে যে কথাগুলি খণ্ডনের জন্য মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ধৈর্য ধরেছিলেন সেই বিরুদ্ধপক্ষের কথাগুলি এই আসরে স্বভাবকবির স্বাধীনতা প্রসঙ্গে পদ্যবন্ধে পরিবেশন করলেন। লম্বোদরবাবু ইতিহাসের পাতা থেকে একে একে সভাকবিদের গৌরবজনক ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে করতে গৌড়েশ্বর ও বাঙালী কবিদের প্রসঙ্গে এসে গুমানী সাহেবকে ঠাট্টা করে প্রায় জীবনানন্দের সুরে বললেন, সভাকবি মাত্রেই স্বভাবকবি। কিন্তু স্বভাবকবি হলেই সভাকবি হওয়া যায় না। আসলে সবই তো ঠিক কবি নয়, কেউ কেউ কবি। গুমানী বললেন, স্বভাবকবির দায় অনেক বড়। সভাকবির লক্ষ্য রাজা আর পারিষদ। বর্ষীয়ান্ দুই কবির বিদগ্ধ কবি সংগ্রাম সেই রাত্রের আসরে এক বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। বছর তিনেক বাদে হঠাৎ একটি চিঠি জিনদিঘী থেকে এল। কিন্তু অতি পরিচিত সেই কাঁপা লেখা নয়, এ হস্তাক্ষর সম্পূর্ণ অপরিচিত। 'শ্রীমান···শরীর অসুস্থ, পা ফুলিতেছে। যদি শেষবারের মত দর্শনের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে কালবিলম্ব না করিয়া চলিয়া আসিও। আত্মজীবনীর ভূমিকার জন্য অন্নদাবাবুকে আমার হইয়া অনুরোধ করিও। উনি আমার প্রতি বরাবর খুবই অনুকূল।···' এই চিঠির ১০।১১ বছর বাদে সম্প্রতি বেতার মারফৎ প্রচারিত সমাচারে জানা গেল শেখ গুমানী দেওয়ান লোকান্তরিত হয়েছেন। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না গত দশ৭টি ধরে উনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছেন। এ লড়াই মঞ্চে উঠে প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথার লড়াই নয় এ লড়াই জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর লড়াই। অশীতিপর বৃদ্ধ চিরবিজয়ী লোকপ্রিয় লোককবি শেখ গুমানী দেওয়ান এখানে পরাজিত।

দীর্ঘদিন গুমানীসাহেবের বিভিন্ন আসরে উপস্থিত থাকা নিঃসন্দেহে অভিজ্ঞতা বিশেষ। কলকাতার রসিক-মনের কাছেও শেখ গুমানী নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না। বিশেষ করে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মঞ্চে কলকাতার মানুষ তাঁকে বহুবার দেখেছেন। মার্কাস স্কোয়ারে সেবার কবির আসর বসেছিল শেখ গুমানী বনাম কিশোরী রায়। শেষরাতে কিশোরীবাবু প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করতে একের পর এক অভিযোগ তুলে চলেছেন। শেখ গুমানী নাকি কিছুই জানে না শুধু ভাঁড়ামি করতে আসরে আসেন। এমন কি শুদ্ধ করে বাঙলা বলতেও উনি পারেন না। রায় কিশোরী একে একে অশুদ্ধ প্রয়োগের নমুনাগুলি তুলে ধরতে থাকলেন। মনে হল গুমানী এবার নিশ্চিহ্ন। শেষ করার আগে কিশোরীবাবু মূল অভিযোগ তুলে বললেন, গুমানী অশুদ্ধ প্রয়োগে বাঙলাভাষাকে চরম অপমান করেছেন। সংস্কৃতি সম্মেলনের মঞ্চে এই 'শব্দ' 'ষণ্ড' জ্ঞানহীন বৃদ্ধকে ডাকার কোন অর্থ তিনি খুঁজে পান না। উনি আমাদের বাঙলাভাষায় দুর্নীতি এনেছেন। অতি বিনয়ীর ভঙ্গীতে গুমানী সাহেব উঠলেন। নিজের অজ্ঞতার কথা, অশিক্ষার কথা ততোধিক বিনয়ের সঙ্গে (কপট বিনয়) বলে হঠাৎ বাঘ হয়ে গেলেন। কোমরের চাদর কষে বেঁধে নিলেন, ডানহাত দিয়ে বাঁদিকের এবং বাঁহাত দিয়ে ডান দিকের গোঁফে চাড়া দিলেন, 'আমি মুখ্যু কি পণ্ডিত সেটা ও বিচার করার কে এলো মশাইরা? বিচারক হবার ওর এত সাধ কেন?' এই বলে গুমানী ডবল ফুকো দিয়ে ধরতাই ছাড়লেন, 'নীতির কথা বলার রীতি কোথা থেকে শিখলে গ॥ আমি নাকি ভাষায় দুর্নীতি আনছি। বলি কি, এটা সুনীতি না দুর্নীতি তা চাটুজ্জাকে ডাক গ। তুমি কে হে ছোকরা। ডাক সুনীতিবাবুকে বলুন তিনি দুর্নীতির কথা।··' সেই গান সকালে শেষ হল, বিশ হাজার রাতজাগা কলকাতার লোক জপমন্ত্র নিয়ে

ঘরে ফিরলেন, 'সুনীতি না দুর্নীতি তা চাটুজ্জাকে ডাক গ।'

সহজ, সরল মানুষ যুক্তি, রসবোধ ও কাব্যক্ষমতাকে সম্বল করে সহৃদয় রসিকমনের সন্ধানে এক-সময়ে বেরিয়ে লোকশিক্ষা ও প্রমোদের মাধ্যম হিসাবে পদ্যবন্ধে যা পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন তা কয়েক শতাব্দী ধরে বাঙলাদেশে কবিগান বলে সমাদৃত হয়। অক্ষর পরিচয় এখানে সৃষ্টির বাধা হয়নি। পরে মধ্যযুগে যখন মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের বিসর্জনের বাজনা ভালো করে বাজেনি তখনি ঢোল কাঁসির উচ্চরোলের মধ্যে দেবদেবীদের সঙ্গে মানুষের কথাও সামনে তুলে ধরে কবিয়ালরা আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। দু' তিনশো বছরের সমাজ-সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে কবিয়ালের ভূমিকা তাই তাচ্ছিল্যের নয়।

৬০।৬৫ বছর ধরে রাতের পর রাত আসর জাগিয়ে দর্শকশ্রোতাদের যিনি রসাপ্লুত করে ভাবনা-সাগরে ডুবিয়ান দেওয়ালেন সেই মহান্ কলাকারের তিরোধান বার্তায় অভাববোধ ফুটে ওঠা স্বাভাবিক। কবিগানের ইতিহাসে গোঁজলা গুঁই, রঘু দাস, নন্দলাল, রামজী, হারুঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, ভবানী বেনে, নীলু রামঠাকুর, ভোলা ময়রা, এ্যান্টনী, হালহেড, রাম বসু, মোহন সরকার, লক্ষ্মী ধোবা, রাম স্যাকরা, গুড়ো দুম্বো, মহেশ কানা, সৃষ্টি ছুতোর প্রভৃতির সঙ্গে একালের কবি হিসাবে যুক্ত হলেন রমেশ শীল, জব্বর আলী, লম্বোদর চক্রবর্তী এবং রসরাজ শেখ গুমানী দেওয়ান।

আলোচনা

আমাদের রঙ

রঙের ব্যাপার মজার। কিন্তু এটা মোটেই সরল নয় চট্ করে বোলচাল দেবার মতন। এতে আছে মানসিকতার আর পরিবেশের নির্দেশ। প্রকাশ মাধ্যম আর উপস্থাপনের ব্যবহারিক প্রয়োজন।

বাঁদিপোতার গামছা, ধনেখালির সাড়ি থেকে বাড়ির রঙ খেলনা পুতুল টুকিটাকি কত কিছুর রঙ এসবেরই একটা মিল অমিল ছিল। এখনও আছে। কিন্তু এখন দেখছি গামছার রঙ-ছাঁদের নক্সায় শাড়ি আসছে। মাটির রঙ ঢেকে ফেলা ছাই-ছাই রঙের শহরগঞ্জের জটিলতায় ঢাকা পড়ে পড়ে যাচ্ছে সব। সবুজ উঠছে বাড়ির দেয়ালে আর সাদারঙ কাগজ ছাড়া আর কিছুতে খুঁজে পাওয়া হয়ে উঠছে কঠিন। এখন একটা মহাগোলযোগ আর লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া ব্যাপার চলছে। জামা কাপড়ের সাদা খোলে আর জমিতে চাষ চলছে বেগুনি-সবুজে 'সরষে ফুলের' চাষ বেশ 'আধুনিকতায়' ভরা নিবিড় পদ্ধতিতে। নানারকমারী, চমৎকারী-দিক্‌দারী আর ঝকমারি নিয়ে বেড়ে ওঠা উঠতি নক্সাবন্দী কাজের বাদামী খেয়াল যেন আজ সবকিছুকেই জটপাকিয়ে দিচ্ছে।

ছাপ্‌তোলা কাপড়-জামার কাজও এখন হরেকরকম। ড্যাবড্যাবে চোখও বাঁতমুখ ছরকুটে থাকা মুখোস, শুঁড়তোলা হাতির থুপথুপানো নাচ ও কানসর্বস্ব খরগোস এখন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। এসমস্তর আশেপাশেই হাঁটছে ধ্যাবড়া পাতি হাঁস; ময়ূররা দল বেঁধে প্যাখম তুলে পায়রার মতন বক বকম করছে। মনের আর বনের টিয়া উড়ে গেছে আর নেই কল্‌কার বক্র-বৃত্ত ছন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য।

কেষ্টঠাকুর এখন সরু সরু হাত পা' নিয়ে 'যখন যেমন তখন তেমন যখন-যেমন-তখন-তেমন' ছন্দে নেচে নেচে ছাইদানীর চারপাশে আঁটকে আছেন। পটের টানেটোনে গড়া মায়ের মুখ ঘটেপটে না থেকে কোন এক আহ্লাদীকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন কোথায়! ফোলা মুখের আহ্লাদী এখন দেয়ালে দেয়ালে লেপ্‌টে আছেন। কেষ্ট ঠাকুর মার্কা ছাইদানীতে ছাইমাখা সিগারেটের টুকরোর পাহাড় উপছিয়ে দেওয়া শিক্ষিত লোকের জাবনাকাটা নির্লিপ্ত শিল্পের আড্ডা এবং বিচার চলছে জোর কদমে।

বাংলার মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল এখন সরে পড়ল বলে মাথা নীচু করে। 'পেলাষ্টিক্' ছাচের কেরামতিতে একরঙা মুরগী, ঘোড়া, খরগোস, বাঘ, হাতি, বক সব একাকার। কাগজে কাগজে মগজের খাঁজে খাঁজে আহ্লাদে আহ্লাদে সঙের বাহার। হঠাৎ কাগজ ছাড়িয়ে এই সব সঙের মত মানব-মানবীরা বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। এরা বিলেতী নয়। নয় কলকাত্তাই। দেহাতী নয়। বিদেশী নয়। কিছুই নয়। শুধুই এরা বাজারী কাগজের জের। গায়ে গায়ে তাদের মাছরাঙা, কাদাখোঁচা, ছাতার দিয়ে মেশান রঙের কেরামতি। এই সব 'বকচ্ছপ', 'হাঁসজারু'দের যোগানদার

মজাদার ভেংচিকাটনেওলা নক্সাদারদের কদর কত। এখানে মহেনজোদারোর সীলমোহর, 'ফোক্-শিল্পের ঘোড়া, অতীতের শিলালিপি আর খেমটায় ভরতনাট্যে কথাকলিতে মণিপুরীতে মেশান কি অপূর্ব পঞ্চরঙ্ দিয়ে গড়া নক্সার বাড়বাড়ন্ত।

শ্যামলতায় স্নিগ্ধ দেহে হলুদছোপান রঙ, গভীর সাদা-কাল আর লাল-কমলা, গেরিমাটির গাম্ভীর্যমণ্ডিত বস্ত্রসম্ভার চলে যাচ্ছে কোন যাত্রায়? এখন পরব তাঁত দেখাবে পশম। থাকব চিরচেনা গ্রাম গঞ্জে শহরে কিন্তু পরব এমন লুঙ্গি-জামা-কাপড় যা দেখলে মনে হবে সেসব যেন রংরাজের ঘরমোছা ন্যাতা, জংলা সাড়ির বা বেনারসীর আঁচল, অথবা সতরঞ্চির নক্সা, কিম্বা বেমক্কা লালরঙ মাখামাখির আদলদেওয়া কশাইয়ের রক্তমাখা ঝাড়ন এবং হাসপাতালের ফেলে দেওয়া পট্টির টুকরো। বিষয় বৈচিত্র্য আমাদের মস্ত বড় সম্পদ!

অতি মার্জিত তর্ক-বিতর্কের ঘোরে আর ঘুরপাকে কেউ প্রশ্ন তুললে কোণঠাসা করে দিয়ে বলব 'সবচাইতে ভাল রঙ ধূসর অথবা শাদার ধবধবে আর সবজের জ্যাবজ্যাবে আর কালোর কালচে মেশান রঙই মহত্তর'। একেই যথার্থ পর্যায়ে নিয়ে গেলেই লোকে হয়ে উঠবে 'যোগ্যতর'। এতে বেশ কায়দা করে ঢেকে রাখা যাবে কামনা বাসনা আশা ও আদর্শের ধূসর অক্ষমতাটা। 'ইচ্ছের' রঙের এই বিকট খেলাট অধুনা বেশ জমে উঠেছে। তবে আমরা ঠিক ইচ্ছে করে বুঝেশুনে এটা খেলছি না। খেলাটার নিয়ম যাঁরা তৈরী করছেন তাঁদের একই সঙ্গে একরকমের অসংখ্য জিনিষ তৈরী করার কৌশল করায়ত্ত। বাংলার মানুষের অর্থাৎ 'চাষীর-তাঁতির-কুমারের-পটুয়ার-দোকানীর ব্যাপারীর খদ্দেরের আর গেরস্তে'র মাথার উপর দিয়ে এই খেলাটা চলছে। আজ মানুষকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, না মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রচার ও বিপননের ব্যবস্থা গড়ে তুলবে সেটা ঠিক করার সময় এসে গেছে। বাংলার মানুষই ঠিক করবে কাপড়ের খোলে পাড়ে-জমিতে, বাড়িতে বাজারে তৈজসপত্রে বইয়ের মলাটে তারা কোন রঙ চায়। কার থেকে কোন রঙ কি ভাবে কতটা নেওয়া হবে সেটাও ঠিক করবে তারাই। তবেই সেটা হবে বাঙালীর মনের রঙ। ঠিক এই রকম একটা পরিবেশে সহজ দেওয়ানেওয়ায় ভারতীয় জনসমষ্টির বর্ণ ভাবনা বাংলার মানসপটে স্বাভাবিক স্পন্দনে দোলায়িত ও উদ্ভাসিত হবে। ব্যক্তিত্ববিহীন অবস্থানের গুরুভার ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাব আমরা তখনই।

বহুকাল হলদে-সবুজ ওরাংওটাং হয়ে অনেক আছাড় খেয়ে চিৎপটাং হবার পর আজকে এই কথাকটা বলে ফেলে বেশ হাল্‌কা ও ভারমুক্ত মনে হচ্ছে।

কৃষ্ণরতন বিশ্বাস

স মা লো চ না

অমরতীর্থ অমরনাথ॥ শঙ্করপ্রসাদ রায়। আট টাকা। ইলোরা প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স : ২৮ ডোভার রোড, কলকাতা-১৯

ভ্রমণের সঙ্গে প্রায়শই কাহিনী কথাটা এসে পড়ে। আবার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বললে গল্পের ওপর জোর দেওয়া হয় না, বিবরণ বৃত্তান্ত ইত্যাদির মধ্যে থাকে তথ্য সংবাদ অথবা গল্পের পরও আমেজ।

ভ্রমণের আসল তাৎপর্য হল সুদূরের পিপাসা। এই পিপাসা ঐতিহাসিকের যেমন, আধ্যাত্মিক ও রাজনীতিকেরও তেমনই।

তাই ভ্রমণসাহিত্যের দায়িত্ব দ্বিবিধ—জ্ঞান পরিবেশন ও রস সৃষ্টি। যিনি এ দুটির সমন্বয় সাধন করতে পেরেছেন তিনি সার্থক স্রষ্টা। শঙ্করপ্রসাদ রায় তাঁর তুষারতীর্থ অমরনাথে তা পেরেছেন।

অমরনাথ গ্লেসিয়ারের ওপর রামধনুর আলোকচিত্রটি বিরল মূল্যবান সংগ্রহ। চমৎকার প্রচ্ছদে প্রথমেই পাঠকের চোখ টানে তুষারমৌলি হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর বর্ণিল আকাশ মেলারূপের সমারোহ। এই রূপের নেশায় তিনি ভারতের ঐতিহ্যের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে 'অসংখ্য গিরিনির্ঝরিণী তটিনী স্রোতস্বিনী বিধৌত কনককীরিটশোভিত হিমগিরি, মহাযোগী যোগেশ্বর মহাদেবের রূপাকল্পনায়। নিত্যস্নাত' হিমতীর্থ অমরনাথের পথে পা বাড়িয়েছেন দাদা পিসিমাদের স্নেহশীল আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে।

শঙ্করপ্রসাদ কবি। সেটা তাঁর ভাষার ভাবালুতায় প্রকাশ হয়ে পড়ে না। হিমালয়ের প্রকৃতি তাঁর মনের তারে যখন ধ্রুপদী ব্যঞ্জনার তরঙ্গ তোলে তখন বাংলা কবিতার সুনির্বাচিত দু'এক ছত্রে শুনি সেই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি। শুধু কবিতায় নয়, শেষ নাগ নদীর টানে গিয়ে যখন তোলপাড় করে তার শিল্পীমনের ভেতরটা তখন তিনি স্মরণ করেন আচার্য জগদীশচন্দ্রের লেখাও। কখনও বা বিভূতিভূষণ!

নীলগঙ্গা কোলাহাই গ্লেসিয়ার অরণ্যময় আরু শেষনাগের থেকে মহাভারত উক্ত বাসুকিনাগের স্মৃতি সেই সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান বিস্ময় ভূতত্ত্ব ও হাজার রহস্যঘেরা হিমালয়ের বিপুল বিশ্ব তাঁর সমস্ত শিল্পী সত্তাকে আলোড়িত করে তোলে—'গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে যেখানে ভাগীরথী গঙ্গার উৎপত্তি সেখানকার রূপও মহাদেবের জটার মত। 'ব্রহ্ম কমণ্ডলু উছলি ধূর্জটি জটাপর ঝরিয়া'—দেবাদি দেব জটার বাঁধন খুলে দিয়েছেন। দেবী সুরধুনী ছাড়া পেয়ে ছুটে চলেছেন মর্তের মানুষদের উদ্ধার করতে।' ভাষার এই সংযতি শব্দপ্রয়োগের এই নির্মোহ নিরলঙ্কার শিল্পরীতি যথার্থ ভ্রমণ-বিবরণের বস্তুনিষ্ঠ দিকটাকেই তুলে ধরেছে। তিনি মাপ ক'রে যন্ত্রচালাতে জানেন বলেই শব্দের অপব্যবহার তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। সুমিতি তার সাহিত্যগুণ।

লেখকের পথের সঙ্গী রহমান ফেলু রেজাক বাট এমন কি ঘোড়াটা পর্যন্ত লেখকের সরস ঘরোয়া ভঙ্গীতে রচনাগুণে বাস্তব সজীব। সেইসঙ্গে পাহাড়ীদের ভাষাগত অভ্যাস ও জীবনধারার প্রতি লেখকের কৌতূহল পাঠকের রসপিপাসার উদ্রেক না করে পারে না। দুর্গম পথের শ্রম, বিপদ বুক

টিপ-টিপ ভয় তথাকথিত ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে রোমাণ্টিক উপাদান দিয়ে না হক এক সাসপেন্সের ভেতর দিয়ে গল্পের আমেজ এনে দিয়েছে।

এজাতীয় রচনায় চিত্রকল্পতা একটা বড় গুণ বলে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। শঙ্করপ্রসাদের তা আছে। একদিকে কবি-শিল্পীর অনুভব আর একদিকে বিজ্ঞান ভিক্ষুর প্রজ্ঞা এ দুয়ের মিলনে শঙ্করপ্রসাদের তুষার তীর্থ অমরনাথ বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের বেদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু বিবরণ নয় কেবল তথ্য নয় তিনি তীর্থ পথরেণু থেকে কুড়িয়ে এনেছেন মহাজীবনের এক তমোবিনাশী সত্যের আলোক।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান॥ শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীঅঞ্জলি বসু সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। মূল্য চল্লিশ টাকা।

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় অভিধান ও কোষগ্রন্থ প্রকাশের কাজ গত শতক থেকে সুরু হয়েছে। অবশ্য সংকলনকালে সেই কাজ কখনো জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনের মর্যাদা পায়নি। কোন ভূম্যধিকারীর খেয়ালখুশি বা কোন বিত্তশালীর হঠাৎ ঝোঁক এই ধরণের প্রয়াসে উৎসাহ জুগিয়েছে। আঁসিকলোপেদি বা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা জাতের কাজ আমরা আজও কল্পনায় আনতে পারি না, এমন কি অক্সফোর্ড অভিধানের বিরাট কর্মযজ্ঞ আমাদের কল্পনার জগতের বাইরের ব্যাপার। পাশ্চাত্যদেশে বহু লেখকের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসে যে কাজ সমাধা হয় এদেশে ব্যক্তিগত প্রয়াসে সেই অভিধান ও কোষগ্রন্থ সংকলিত হয়। ফলে, বিক্ষিপ্ত প্রয়াসে কোন একটি গ্রন্থ ত্রুটিশূন্য ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠেনি। এমনকি কখনো কখনো পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থের দোষত্রুটি অনায়াসে উত্তরাধিকারসূত্রে পরবর্তী সংকলনে বর্তেছে। আসলে, বিদেশের অনুকরণের ব্যাপারে আমরা বহিরঙ্গ নিয়ে যতটা মাতামাতি করেছি তার ভেতরের শ্রমসাধ্য কর্মশালার সমাচার সম্পর্কে ততটা আগ্রহী থাকিনি। এমনকি এদেশের প্রাচীন কোষ ও অভিধান গ্রন্থের ধারাকে তেমন গুরুত্ব দিইনি যেমনটি দেওয়া উচিত ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অভিধান ও কোষগ্রন্থ সম্পর্কে বেশ কিছু প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং কখনো কখনো সরকারী বদান্যতা ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসে এগুলি পরিকল্পিত ও রূপায়িত হচ্ছে।

অঞ্চলবিশেষের স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিমানুষের জীবনচরিত সংকলনের সার্থকতার দিক নিয়ে আজ আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। এধরণের গ্রন্থ যত বেশি প্রকাশিত ও জনমনে গৃহীত হয় ততই মঙ্গল। আলোচ্য 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান'-এর প্রকাশ সেই দিক থেকে নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। ইতিপূর্বে এই জাতের আঞ্চলিক চরিতাভিধান বাঙলা ভাষায় একাধিক সংকলিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলির ক্ষেত্রে কোন সময়েই স্থায়ী সম্পাদনা বিভাগ রক্ষা দ্বারা পরবর্তী সংস্করণ সংশোধনের চেষ্টা হয়নি। এমনকি 'নিরন্তর সম্পাদনা'র কোন পরিকল্পনা গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত

থাকে নি। ফল হয়েছে, পরবর্তী উদ্যমে আগের ত্রুটি সগৌরবে বিরাজ করেছে। পরবর্তী সংকলকরা প্রাথমিক পরীক্ষার সাহায্যে যদি পূর্ববর্তীর ত্রুটি সংশোধন করে নিতেন তাহলে খানিকটা আশ্বস্ত হওয়া যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেটুকু পরিশ্রম করার উৎসাহ তাঁদের থাকেনি।

বর্তমান গ্রন্থের শিরোনামে 'বাঙালী' কথাটি ব্যবহৃত হলেও সম্পাদকদ্বয় এক বিশেষ অর্থে শব্দটি গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের মনোনত প্রায় সাড়ে তিন হাজার মৃত মানুষের নাম বেছে নিয়েছেন। এই বাছাবাছির ব্যাপারে সম্পাদকদের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলার কিছু নেই কিন্তু যে গ্রন্থের আজ্ঞাপত্রের আত্মবিজ্ঞপ্তিতে 'আকরগ্রন্থ' কথাটির উল্লেখ বর্তমান, সেখানে মৃত ব্যক্তির সারিতে জীবিত ব্যক্তি এসে গেছেন (পৃঃ ৪৯৮, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। কয়েকটি ক্ষেত্রে অতি পরিচিত ব্যক্তির নাম ও কর্মক্ষেত্রের তথ্য যথাযথ না হয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে (নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২৬৩, মৃণালিনী সেন পৃঃ ৪২৮)। একই ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে দুবার দুরকম তথ্য পরিবেশন এই 'আকর'গ্রন্থে ঘটেছে। যেমন, নিত্যকৃষ্ণ বসু সম্পর্কে পৃঃ ২৫৭ লেখা হয়েছে : 'নিত্যকৃষ্ণ বসু (?—২৯. ৩. ১৩০৭) এম. এ. পাশ করে কোন্নগর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁর রচিত বহু ছোট ছোট কবিতা আছে। এছাড়া তাঁর সাহিত্য সমালোচনামূলক 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য।' আবার পৃঃ ৬২৭ একই ব্যক্তি সম্পর্কে লেখা হচ্ছে : (১৮৬৫-১৯০০)। সুকবি। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ। কোন্নগর ইংরেজী স্কুলে হেডমাষ্টার পদে নিয়োজিত ছিলেন। 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী' লিখে বাঙলার সুধীসমাজে সুপরিচিত হন। তাঁর রচিত ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : মায়াবিনী (কাব্য), প্রেমের পরীক্ষা (নাটক) ও ভবানী (গল্প)।' নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পর্কে পৃঃ ২৩০-এ একবার বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে পরিচয় দিয়ে আবার পৃঃ ৬২৬ অতি সংক্ষেপে ভিন্ন বয়ানে তথ্য পরিবেশিত হল। পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থের ভুল তথ্য কেমন অনায়াসে বর্তমান গ্রন্থে এসে গেছে (পৃঃ ১৩৫ গোবিন্দ অধিকারী)। যাত্রাজগতের দিক্‌পাল গোবিন্দ অধিকারীর জন্ম হুগলী-কৃষ্ণনগর। কবে একবার কে কৃষ্ণনগর দেখে লিখে বসেছিলেন নদীয়া এবং তারপর থেকে কৃষ্ণনগর. নদীয়া চলতে থাকল। বর্তমান অভিধানে লেখা হয়েছে 'জাঙ্গীপাড়া-নদীয়া' এই ধরণের বেশ কিছু অসঙ্গতি গ্রন্থটিতে ছড়িয়ে আছে। বহু পূর্বে ত্যক্ত তথ্যও এখানে সযতনে গৃহীত হয়েছে (পৃঃ ৩৭১, ভবদেব ভট্ট)।

মধ্যযুগের সাহিত্যকার, সন্ত-মোহান্ত ও অন্যান্য ব্যক্তিত্ব যাঁদের সম্পর্কে যথাযথ তথ্য আজও সংগৃহীত হয়নি তাঁদের চরিতকথার নামে খানিক গাল-গল্প নির্বিঘ্নায় এখানে পরিবেশিত হয়েছে। বস্তুত মধ্যযুগের ব্যক্তিদের আজগুবি কাহিনী পরিবেশন করতে গিয়েই সম্পাদকদ্বয় সমগ্র প্রয়াসটিকে নেহাৎই বাণিজ্যিক লঘুকর্মে দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। এই ধরণের অভিধান ত্রুটিমুক্ত হওয়া হয়ত দুরূহ ব্যাপার কিন্তু নিঃসন্দেহে বাঞ্ছনীয়। স্থায়ী সম্পাদনা দপ্তর তথা 'নিরন্তর সম্পাদনা'র সাহায্যে ত্রুটিহীন চরিতাভিধান রচনা আজকের দিনেও সম্ভব বিদেশের কাছ থেকে এই শিক্ষা আমাদের নেবার আছে।

পক্ষধর ভট্টাচার্য

প্রগতির নতুন প্রেরণায়
ভারত 1975-76

বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রগতি

- এ পর্যন্তকার সর্বোচ্চ পরিমাণ…76,764 মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুতের উৎপাদন… দিনের হিসেবে 260 মিলিয়ন ইউনিটের রেকর্ড-মাত্রা পৌঁচেছে।

- পঁচিশটি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে 1000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছে… সেপ্টেম্বর 1975 থেকে মার্চ 1976-এর মধ্যে কুড়িটিতে।

- এ বছরে অতিরিক্ত 2,050,009 হেক্টেয়ার জমিতে সেচের সুবিধা পৌছবার সম্ভাবনা আছে।

- আরোও 6,356টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁচেছে…এমন গ্রামের মোট সংখ্যা 174,079 ; প্রায় 140,000টি পাম্পসেট বিদ্যুৎচালিত করা হয়েছে।

76/89 (Bengali)